গল্পে

মহাকাব্য রামায়ণ

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭-বি, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান :
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৪/১, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

মহাকাব্য রামায়ণ গল্প করে লেখা হ'ল, এটা যাদের জন্য লেখা হ'ল তাদের পড়তে ভাল লাগলে খুশী হব।

গ্রন্থকার

-৫৭

সূচীপত্র

রামায়ণ কথা

অযোধ্যায় এক রাজা ছিলেন দশরথ তাঁর নাম।
তিনটি রাণী চারটি ছেলে বড়টির নাম রাম॥
রামের রূপে জগৎ আলো ভোলে চরাচর।
রামের গুণে বন্দী হ'ল বনেরই বানর॥
চণ্ডালেরে কোল দিলেন রামগুণমণি।
ধনুক ভেঙে কল্লেন বিয়ে জনক নন্দিনী॥
শ্রীরামেরে রাজ্য দিতে রাজার দেখে মন।
দুষ্টমতি মেজরাণী পাঠিয়ে দিলেন বন॥
মাথায় জটা, বাকল পরা, হাতে ধনুক-বাণ।
বাপের কথা রাখতে বনে চ'লেছেন শ্রীরাম॥
মাঝখানে যান সীতাদেবী আলো ক'রে বন।
সবার পিছে ধনুক হাতে চ'লেছেন লক্ষ্মণ॥
বনের মাঝে কুটীর বেঁধে ছিলেন তিনজন।
একলা ঘরে সীতা হ'রে নিল দশানন॥
সাগর বেঁধে রাবণ ব'ধে রামগুণমণি।
উদ্ধারিলেন সাধ্বীসতী সীতাঠাকুরাণী॥
সীতায় ল'য়ে সুখী হ'য়ে শ্রীরামের দিন যায়।
হরি হরি বল সবে পালা হ'ল সায়॥

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

(এক পাতায় সম্পূর্ণ রামায়ণ)

সূচনা



াবন ছিলেন মহামান্য ঋষি। কিন্তু তাঁর পুত্র দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নর্বাহ করতেন,—নাম রত্নাকর—

একটা গভীর বনে ছিল তাঁর আস্তানা। পথের ধারে একটা াছের ওপর উঠে বসে থাকতেন, আর পথ দিয়ে কোন লোক গেলেই াকে প্রথমে লাঠির ঘায়ে মেরে ফেলতেন। তারপর তার সব কিছু কড়ে নিতেন। এইভাবে তিনি সংসার চালাতেন।

ঋষিপুত্রের এইরকম পাপকাজ দেখে স্বর্গের দেবতারাও বিচলিত য়ে পড়লেন। তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে পৃথিবীতে এলেন পিতামহ হ্মা আর দেবর্ষি নারদ।

একদিন ছদ্মবেশে দেবর্ষি নারদ ও পিতামহ ব্রহ্মা বনের পথ দিয়ে লেছেন। হঠাৎ রত্নাকর গাছ থেকে নেমে লাঠি নিয়ে তাঁদের মারতে

ছুটে এলেন। তখন ছদ্মবেশী দেবতারা বললেন, তুমি কে? আ
আমাদের মারতে আসার কারণ কি?

রত্নাকর তখন নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর তাঁর দস্যুবৃি
করার কারণ বললেন।

দেবতারা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, পৃথিবীতে অ
রোজগারের কত রকম পথ রয়েছে। সেই সমস্ত ছেড়ে তুমি এ
হীন পথ বেছে নিলে? এই যে এত পাপ করছো এ পাপের ভাগ
কে হবে?

রত্নাকর সহজ ও ভারি কণ্ঠে বললেন, আমি যাদের জন্যে এই কাণ্ড
করছি তারাই আমার পাপের ভাগী হবে।

দেবতারা শুনে একটু হাসলেন, তারপর বললেন, তা হয় না বৎস
কেউ তোমার পাপের ভাগী হবে না। সমস্ত পাপের ফল তোমাবে
একাই ভোগ করতে হবে। একবার বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসে
সকলকে, তাহলেই বুঝতে পারবে।

রত্নাকর শুনে খুব হেসে উঠলেন। বললেন, ঠাকুর বুঝেছি, আি
বাড়ী যাবো আর তোমরা সেই সুযোগে পালিয়ে যাবে—এই তো
তা' হতে দেবো না। আমি যাচ্ছি, তবে যাবার আগে তোমাদে
বেঁধে রেখে যাবো।

এই বলে রত্নাকর বড় বড় লতা গাছ এনে একটা গাছের সংগে
দু'জনকেই বাঁধলেন। তারপর গেলেন নিজের বাড়ীর দিকে।

বাড়ীতে ঢুকে প্রথমেই মা ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা
রত্নাকরের পাপের ভাগী হবেন কিনা?

মা ও বাবা শুনে বললেন, না বাবা, নিজের পাপের ফল নিজেকেই
ভোগ করতে হয়, কেউ কারো পাপের ভাগী হয় না। বুড়ো বাবা

মাকে খাওয়ানো-পরানো ছেলের কাজ। না করলে আরো পাপ হত। আমরা তোমার পাপের ভাগী তো হব না।

পিতামাতার কাছ থেকে এই জবাব শুনে রত্নাকর গেলেন স্ত্রীর কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, একই প্রশ্ন। কিন্তু স্ত্রীর জবাব, তুমি আমাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছ। সুতরাং আমার ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তোমার। আমি তোমার পাপের ভাগী হতে পারি না।

সকলের কাছে একই জবাব শুনে রত্নাকর মাথায় হাত দিলেন। এত পাপ করেছেন, কি করে তা' থেকে উদ্ধার পাবেন তিনি। ছুটে গেলেন, সেই দুই ব্রাহ্মণের কাছে। বাঁধন মুক্ত করলেন। পায়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, ঠাকুর আমাকে রক্ষা কর। আমার যে পাপের সীমা-পরিসীমা নেই।

রত্নাকরের কাতর আর্তনাদে ব্রহ্মা ও নারদ নিজমূর্তি ধারণ করলেন। তারপর রত্নাকরকে অভয় দিয়ে গেলেন, বৎস, তোমার কোন ভয় নেই। এ জগতে মহাপাপীরও উদ্ধার আছে। তুমি 'রাম'-নাম জপ কর। তাহলেই তোমার সব পাপ কেটে যাবে।

সেই বনের মধ্যে বসেই রত্নাকর 'রাম'-নাম জপ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হায়, পাপে জিভ্ যে তাঁর আড়ষ্ট। তাই 'রাম' উচ্চারণ করতে পারলেন না। 'মরা' 'মরা' বলে জপ করতে লাগলেন। এইভাবে উচ্চারণ করতে করতে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ হোল। তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন, দেহ নির্জীব হয়ে গেল। সমস্ত জ্ঞান লোপ পেল। দেহ জুড়ে উইপোকা বাসা তৈরী করে ফেললো। উইটিবিকে সংস্কৃতে বলে বল্মীক। ষাট হাজার বছর তপস্যা শেষে উইটিবি বল্মীক ভেঙে বেরিয়ে এলেন দস্যু রত্নাকর। নাম হোল মহর্ষি বাল্মীকি।

ঋষি বাল্মীকি এখন তমসা নদীর তীরে একটা ছোট্ট কুটীর তৈরী করে বাস করতে লাগলেন। সেইখানেই চলে তাঁর তপস্যা আর জপতপ।

একদিন প্রভাত বেলা। মহর্ষি বাল্মীকি তমসা নদীর তীর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তমসার জল কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে প্রভাতের শীতল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। গাছের ডালে বসে ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী পাখী। অকস্মাৎ এক ব্যাধের তীর এসে বিঁধলো ক্রৌঞ্চের বুকে। রক্তাক্ত পাখীটা লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর। আর ক্রৌঞ্চীর আর্তনাদে সমস্ত বনভূমি হাহাকার করে উঠলো। ক্রৌঞ্চীর দুঃখে মহর্ষির হৃদয় গলে গেল। হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছন্দোবদ্ধ শ্লোক। ঋষি অবাক হয়ে গেলেন, কি করে তিনি এমন সুন্দর শ্লোক রচনা করলেন।

এমন সময় স্বর্গ থেকে নেমে এলেন পিতামহ ব্রহ্মা। বললেন বৎস, আজ যে শ্লোক প্রথম তোমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো এর নাম 'অনুষ্টুপছন্দ'। মানবসমাজে এর আগে কেউ এমন শ্লোক উচ্চারণ করতে পারেনি। তুমি পেরেছ, তুমি মহর্ষি। আজ হতে তুমি হলে আদি কবি। কবিকুলের গুরু। পৃথিবীর পাপের ভার কমাবার জন্যে পৃথিবীতে আসছেন নারায়ণ। তিনি মানুষরূপ ধারণ করে অযোধ্যার রাজা হবেন। সেই পূত চরিত্র রামচন্দ্রের জীবনকথা নিয়ে তুমি লিখবে ঐ রকম হাজার হাজার শ্লোকে মহাকাব্য।

ব্রহ্মার উপদেশ পেয়ে রামচন্দ্র জন্মাবার আগেই বাল্মীকি লিখে ফেললেন 'রামায়ণ' মহাকাব্য।

রামায়ণের সেই পবিত্র কথা এখানে ছোটদের উপযোগী করে লেখা হোল।

আদিকাণ্ড



অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। সে সময় আমাদের দেশে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। রাজা দশরথ যেমন ছিলেন বীর তেমনি ছিলেন সৎ আর সত্যবাদী। প্রজাদের তিনি নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন। দেশে ছিল শান্তি। প্রজাদের কোন অভাব অভিযোগ ছিল না।

আর অযোধ্যা রাজ্যটা ছিল একখানি ছবির মত। রাজধানীর ভেতর দিয়ে সরযূ নদী বয়ে যেত। সুন্দর পথঘাট, বাড়ী, বাগান। বাগানে নানারকম ফুলগাছ। ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকতো গাছগুলো। সুখ শান্তিতে ভরা ছিল এই অযোধ্যা নগর।

কিন্তু তবুও রাজা দশরথের মনে একবিন্দু শান্তি ছিল না। তাঁর ছিল তিন রাণী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা। কিন্তু

তিন রাণীর কারোরই কোন পুত্র কন্যা ছিল না। এই দুঃখে দশরথ অস্থির। এত থেকেও যেন তাঁর কিছুই নেই। তাই তিনি একদিন তাঁর মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, দেখো, আমি পুত্রলাভের জন্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবো। তাঁরা সকলে মত দিলেন। রাজার পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ মুনি। তিনি বললেন, এই যজ্ঞের জন্য একজন খুব ভাল পুরোহিত দরকার। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ যে-সে পুরোহিত দিয়ে করানো যায় না। এ কাজের উপযুক্ত পুরোহিত হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি বড় ঋষি। অঙ্গদেশের লোমপাদ রাজার জামাই তিনি।

এই কথা শুনে দশরথের খুব আনন্দ হোল। কারণ লোমপাদ রাজা দশরথের অত্যন্ত বন্ধু লোক। সেইজন্যে তিনি ঠিক করলেন, তিনি নিজে গিয়েই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে সংগে নিয়ে আসবেন।

রাজবাড়ীতে সংগে সংগে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। রাজা দশরথ চললেন অঙ্গদেশে। সংগে চললো পাত্র-মিত্র, হাতী, ঘোড়া, লোক-লস্কর। রাণীরা চললেন দশরথের সংগে।

এদিকে সরযূ নদীর তীরে একটা প্রকাণ্ড মাঠে আয়োজন হতে লাগল যজ্ঞের। সকলে মিলে মণ্ডপ তৈরীর কাজে লেগে গেল। তৈরী হোল বড় বড় উনুন। বিরাট ভোজ হবে। দেশ-বিদেশের রাজারা আসবেন। নিমন্ত্রিত হবে সারারাজ্যের লোক। রাজকীয় যজ্ঞই বটে!

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মাথায় ছিল হরিণের মত শিং। সেইজন্যে তাঁর নাম হয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গ। মহারাজ দশরথ একদিন সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে সংগে নিয়ে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। সারারাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে হৈ-চৈ। আনন্দে ছেলে-বুড়ো কারো চোখে ঘুম নেই।

ভালভাবেই যজ্ঞ শেষ হলো। মহারাজ দশরথ অকাতরে সকলকে টাকা-পয়সা, মণিমুক্তা, ধনরত্ন দান করলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর আরম্ভ হোল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। এই যজ্ঞ করলেই রাজার ছেলে হবে। এবারেও আগের মতই ঘটা হোল।

যখন যজ্ঞ শুরু হোল সেই সময় যজ্ঞের আগুন থেকে বের হলেন এক দিব্যকান্তি পুরুষ। তাঁর গায়ের রঙ্ নীল। চোখ দুটো লাল আর টানাটানা। দাড়ি গোঁফ সিংহের কেশরের মত। পরনে তাঁর টকটকে লাল কাপড়। হাতে তাঁর সোনার থালায় ক্ষীরের পায়েস। সেই দেবপুরুষ মহারাজ দশরথকে বললেন, মহারাজ, এই পায়েস ব্রহ্মা পাঠিয়েছেন। আপনি এটা রাণীদের খেতে দিন। তাহলেই আপনার ছেলে হবে। এই কথা বলেই তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেলেন।

দশরথের তখন কি আনন্দ। তিনি পায়েস নিয়ে গিয়ে রাণীদের দিলেন। সেই পায়েস খেয়ে ব্রহ্মার বরে দশরথের তিন রাণীর কোল আলো করে এলো চারটি ছেলে। বড় রাণী কৌশল্যার ছেলে রাম, মেজো রাণী কৈকেয়ীর ছেলে ভরত, আর ছোট রাণী সুমিত্রার হোল দুটি ছেলে। বড়টির নাম লক্ষ্মণ, আর ছোটটির নাম শত্রুঘ্ন।

ভায়েদের মধ্যে ভারি ভাব। এক সংগে এঁরা লেখাপড়া শেখেন। এক সংগে অস্ত্র শিক্ষা করেন। মহামুনি বশিষ্ঠের হাতেই এঁরা সর্ববিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। এইভাবে বেশ আনন্দেই দিনগুলো কাটছিল।

এমন সময় একদিন রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বামিত্র মুনি। তাঁর তপস্যারও যেমন জোর ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন বদ্‌মেজাজী। সেইজন্যে সকলে তাঁকে খুব ভয় পেত। দশরথ তাই

তাঁকে খুব সমাদর করে বসালেন। তারপর বললেন, আজ্ঞা করুন, কি করতে হবে আমাকে। বিশ্বমিত্র মুনি বললেন, মহারাজ, আমি রামকে কয়েকটা দিনের জন্যে নিয়ে যাবো। কারণ মারীচ আর সুবাহু নামে দুটো রাক্ষস আমাদের যজ্ঞ নষ্ট করে দিচ্ছে। রাম ছাড়া ও দুটোকে কেউ মারতে পারবে না।

মুনির কথা শুনে দশরথের তো অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। অবশ্য রাম এখন বড় হয়েছে। সেও রাক্ষস মারতে পারবে। দশরথ মহা চিন্তায় পড়লেন। কিন্তু কি করেন! না বললে মুনি রেগে শাপ-শাপান্তর করবেন। বিশ্বামিত্র বললেন, মহারাজ, আপত্তি করবেন না, এতে রামের ভালই হবে। বশিষ্ঠ মুনিও তাই বললেন।

একদিন সকালে বিশ্বামিত্র মুনি রামচন্দ্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সংগে চললেন লক্ষ্মণ। পথে যেতে যেতে বিশ্বামিত্র মুনি রামকে শিখিয়ে দিলেন 'বলা' আর 'অতিবলা' নামে দুটি মন্ত্র। এই মন্ত্র জানলে কোন অসুখ করে না, হাজার পরিশ্রমে কোন কষ্ট হয় না। আর যুদ্ধে কেউ হারাতে পারে না। হাঁটতে হাঁটতে যখন তাঁরা সরযূ নদীর তীরে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আর যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে রাত্রিটা তাঁরা সরযূ নদীর তীরে কাটালেন। ভোরে উঠে আবার চলা শুরু হোল। বহুদূর পথ চলার পর তাঁরা এলেন অঙ্গদেশে। সেখানে মুনিদের আশ্রমে বিশ্রাম করলেন। তারপর নৌকায় করে গঙ্গাপার হয়ে অপর পারে এলেন। এইখানেই সেই ভয়ানক বন। এই বনেই আছে তাড়কা রাক্ষসী। আগে এখানে ছিল একটা সুন্দর সহর। কিন্তু আজ গভীর বন। তাড়কা রাক্ষসীর অত্যাচারে সকলে দেশ ছেড়ে চলে

গেছে। তার উৎপাতে বহুলোক মারা গেছে। মানুষজন না থাকায় সেই সুন্দর সহর আজ বনে ঢেকে গেছে।

এই বনে এসে রামকে বিশ্বামিত্র বললেন, তাড়কা রাক্ষসীকে তোমাকে মারতে হবে। রাম বললেন, আচ্ছা। তারপর রাম যেই ধনুকের ছিলায় টান দিলেন সংগে সংগে এমন একটা শব্দ হোল যাতে সমস্ত বনভূমি থরথর করে কেঁপে উঠলো। বনের সমস্ত পশু-পাখী, জন্তু-জানোয়ার ভয়ে শিউরে উঠলো। তাড়কাও প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তারপরে নিজমূর্তি ধারণ করে রাম লক্ষ্মণকে গিলে ফেলবার জন্যে তেড়ে এলো। উঃ, কী গর্জন! সমস্ত বন থরথর করে কাঁপছে। তার পায়ের দাপটে ছিটকে আসছে বড় বড় পাথর। শরীরের ধাক্কায় বড় বড় গাছগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। চারিদিকে ধুলোয় অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রাম ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। তিনি তীর মেরে কেটে দিলেন তার হাত দুটো। লক্ষ্মণের তীরে কেটে গেল তার নাকটা। সংগে সংগে ভীষণ চীৎকার করতে করতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সে, আর সংগে সংগে লুকিয়ে পড়ে বড় বড় পাথরের চাঁই ছুঁড়তে লাগলো রাম লক্ষ্মণের দিকে। তারপর তাড়কা ভীষণ রেগে বিরাট হাঁ করে রাম লক্ষ্মণকে গিলে খাবার জন্যে যেই ছুটে এলো অমনি রাম তার বুক লক্ষ্য করে একটা ভীষণ বাণ ছুঁড়লেন। সেই বাণ বুকে লেগেই তাড়কা রাক্ষসী লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তাড়কা মরে যাওয়ার সংগে সংগে আকাশ থেকে দেবতারা রামের বীরত্ব দেখে খুব আনন্দ করতে লাগলেন। আর বিশ্বামিত্রও খুব আনন্দ পেলেন।

তারপর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে আবার এগোতে লাগলেন। চলতে চলতে এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বামিত্র নিজের আশ্রমে।

সেখানে এসে বিশ্বামিত্র বললেন, এবার আমি তপস্যায় বসবো, তোমরা অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে থাকো। কারণ আমি তপস্যায় বসলেই রাক্ষসেরা আমার যজ্ঞ পণ্ড করার চেষ্টা করবে। বিশ্বামিত্র তপস্যায় বসলেন। আর রাম লক্ষ্মণ তীর-ধনুক নিয়ে পাহারা দেন। প্রথম দুদিন কিছুই ঘটলো না। কিন্তু তৃতীয় দিন শুরু হোল ভীষণ উৎপাত, তপস্যার বেদীতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। চারদিক থেকে রক্ত বৃষ্টি হতে লাগলো। মারীচ আর সুবাহু বহু রাক্ষস নিয়ে যজ্ঞ পণ্ড করতে এসেছে। রাম সংগে সংগে তীর ছুঁড়তে লাগলেন। রাক্ষসরা রামের সামনে আর দাঁড়াতে পারলো না। একে একে সমস্ত রাক্ষস মারা পড়লো। এই দেখে বিশ্বামিত্র আর আশ্রমের অন্যান্য মুনি ঋষিরা খুব খুশী হলেন।

এবার সবাই চলেছেন মিথিলার দিকে। মিথিলা জনক রাজার রাজধানী। জনক রাজা একবার লাঙ্গল দিতে দিতে লাঙ্গলের ফালে উঠে আসা একটি কন্যা পেয়েছিলেন। নাম রেখেছিলেন তার সীতা। রূপে গুণে মেয়েটি দেবীতুল্য। মেয়েটি এখন বড় হয়েছে। মিথিলায় তার স্বয়ম্বর সভা। জনক রাজার বাড়ীতে একটি ধনুক আছে। সেটি শিবের 'হরধনু'। সেটা যেমন ভারী তেমনি বড়। গুণ পরানো তো দূরের কথা, কেউ সেটা তুলতেই পারে না। জনক রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে ধনুকটিতে গুণ পরাতে পারবে তার সংগে তিনি সীতার বিয়ে দেবেন। বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে চললেন সেইখানে। মিথিলায়, স্বয়ম্বর সভায়।

যেতে যেতে রাম দেখতে পেলেন পথের মাঝখানে একটি সুন্দর তপোবন, ভারি মনোরম জায়গা। রামের জায়গাটি খুব ভাল লাগল। জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বামিত্রকে, এটি কোন্ জায়গা? বিশ্বামিত্র

বললেন, এটি গৌতমের তপোবন। গৌতমের অভিশাপে তাঁর পত্নী অহল্যা এখানে পাথর হয়ে আছেন। তিনি বলে গেছেন, রামের পায়ের ছোঁয়ায় তিনি আবার শাপমুক্ত হবেন। জীবন ফিরে পাবেন। রাম সেই তপোবনে পাথরের কাছে যেতেই অহল্যা উঠে বসলেন। পূজো করলেন রামচন্দ্রের। রাম লক্ষ্মণও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

এরপর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মিথিলায়। জনক রাজা তো ছেলে দুটিকে দেখে খুব খুশী। তাদের আদর যত্ন করে বসালেন। বিশ্বামিত্র মুনির কাছে শুনলেন, তাদের বীরত্বের কথা। বললেন, এদের দুজনের নাম রাম আর লক্ষ্মণ। এরা অযোধ্যার রাজা দশরথের ছেলে। এদের গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করে, অহল্যাকে উদ্ধার করে এরা এসেছে আপনার রাজধানীতে—শিবের দেওয়া 'হরধনু'টি দেখতে।

জনক রাজা তো আনন্দের সংগে নিয়ে গেলেন 'হরধনু' দেখাতে। রাম একবার ধনুকটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর অতি সহজভাবে গুণ পরিয়ে যেই টংকার দিয়েছেন অমনি ধনুকটা মড়্ মড়্ করে ভেঙে দু'খানা হয়ে গেল।

সকলেই অবাক। এবার সীতার সংগে রামের বিয়ে হবে। দশরথ সংবাদ পাওয়ামাত্র ভরত, শত্রুঘ্ন, রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ আর পাত্রমিত্র সভাসদ্দের নিয়ে হাজির হলেন মিথিলায়। তারপর একটা শুভদিনে বশিষ্ঠের কথামত রামের সংগে সীতার, লক্ষ্মণের সংগে জনক রাজার নিজের মেয়ে উর্মিলার বিয়ে হোল। আর রাজার দুই ভাইঝি মাণ্ডবীর সংগে ভরতের আর শ্রুতকীর্তির সংগে শত্রুঘ্নের মহাধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল।

মহারাজ দশরথ তারপর বিয়ের দানে পাওয়া ধনরত্ন, দাসদাসী, হাতী, ঘোড়া আর পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু পথে আবার বিপদ। যার চেহারা দেখে বড় বড় বীরপুরুষেরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, যার পায়ের চাপে পৃথিবী থরথর করে কেঁপে ওঠে—সেই পরশুরাম পথ আগলে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে মস্ত বড় একটা ধনুক, কাঁধে একটা বিরাট কুড়ুল। তিনি ক্ষত্রিয়দের একেবারে দেখতে পারতেন না। বহুবার তিনি পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য করেছেন। তাঁকে দেখেই দশরথের অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা।

পরশুরাম রামকে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি শিবের 'হরধনু' ভেঙেছ! এবার আমার ধনুকটাতে গুণ পরাও তবেই বুঝবো তুমি বীর। তারপর আমি তোমার সংগে যুদ্ধ করবো। দশরথ পরশুরামকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। রামও হাতজোড় করে অনেক বোঝালেন, কিন্তু পরশুরামের এককথা। আগে ধনুকে গুণ পরাও, তারপর তোমার সংগে যুদ্ধ করবো। তখন রাম রেগে গিয়ে ধনুকটা নিয়ে এমন জোরে গুণ পরালেন যে, পরশুরাম একেবারে চুপ, যুদ্ধ করার আর সাহস হোল না। মাথা নীচু করে চলে গেলেন মহেন্দ্র পর্বতের দিকে। দশরথ আর তাঁর লোকজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

অযোধ্যায় যেদিন ফিরে এলেন সেদিন সারা অযোধ্যায় উৎসব শুরু হয়ে গেল। রাণীমা-রা বরণ করে বউদের ঘরে তুললেন। দশরথের আনন্দ আর ধরে না। রাজ্যের প্রজারাও খুব খুশী। সকলের মুখে এককথা, আহা! রাম লক্ষ্মণের মত ছেলে আর দেখা যায় না।

অযোধ্যাকাণ্ড



রাজা দশরথ বুড়ো হয়েছেন। তাঁর বয়স হোল প্রায় ষাট হাজার বছর। তাঁর ইচ্ছা এবার তিনি রামকে যুবরাজ করেন। মন্ত্রীদের ডেকে দশরথ জানালেন তাঁর ইচ্ছার কথা। শুনে সকলেই খুব খুশী।

সারা অযোধ্যা নগরে এই কথা ছড়িয়ে পড়লো। প্রজাদেরও আনন্দ আর ধরে না। রাজপ্রাসাদে আর রাজ্যের সর্বত্র উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। চারিদিকে দূত ছুটলো সকল রাজ্যের রাজাদের নিমন্ত্রণ করতে। বিরাট সভা হবে, কত মাণ্যগণ্য লোক, কত রাজা-রাজড়া আসবেন তার আর শেষ নেই। উৎসবের ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। পথঘাট পরিষ্কার হতে লাগলো। পথে ছড়িয়ে

দেওয়া হোল হাজার হাজার পদ্মের পাপড়ি। রাস্তার ওপরের বাড়ীঘর সাজিয়ে মঙ্গলঘট বসানো হোল। রাজপ্রাসাদেও নানা-রকম আয়োজন চলতে লাগলো। রামের অভিষেকের জন্যে চারিদিক উৎসবমুখর।

এদিকে রাণী কৈকেয়ীর ছিল এক দাসী তার নাম মন্থরা। সে দেখতে যেমন কদাকার তেমনি পিঠে ছিল একটা বিরাট কুঁজ। মনটাও ছিল তার খুব কুটিল। রাণীমা তাকে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

একদিন সে শুনতে পেল, রাম যুবরাজ হবেন। তারই অভিষেকের আয়োজন হচ্ছে। কথাটা শুনেই হিংসায় তার সারা শরীর জ্বলে গেল। ছুটে এলো কৈকেয়ীর কাছে। তারপর কৈকেয়ীকে বললো, শুনেছ, রাম যুবরাজ হচ্ছে। কৈকেয়ী তখন পালঙ্কে শুয়ে ছিলেন। এই কথা শোনামাত্র তিনি আনন্দে মন্থরাকে একটি সোনার গহনা উপহার দিলেন। বললেন, খুব আনন্দের কথা। রাম বড় ছেলে, সেই তো রাজা হবে।

কুঁজি তো রেগে গহনা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর বললো, এটা বুঝি তোমার কাছে খুব আনন্দের কথা হোল! জান, রাম রাজা হলে তুমি হবে কৌশল্যার দাসী, আর রাম ভরতকে মেরে ফেলবে। একথা শুনে কৈকেয়ী হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তুই রামকে চিনিস না। সে আমাকে কত ভক্তি করে। রাম আর ভরত দুজনই আমার কাছে সমান।

এই কথা শুনে কুঁজি মন্থরা আরো রেগে গিয়ে রাম সম্বন্ধে যা-তা করে বলতে লাগলো। শুনতে শুনতে কৈকেয়ীরও মনে

সন্দেহ জাগলো। কিন্তু উপায় কি? কুঁজি বললো, উপায় একটা আছে। তাই তো তোমাকে বলতে এসেছি। একবার অসুরদের সংগে যুদ্ধে মহারাজ দশরথ ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। সে সময় সেবাযত্ন করে তুমিই তাঁকে সারিয়ে তুলেছিলে। তখন মহারাজ দশরথ সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে দুটো বর দিতে চেয়েছিলেন। তুমি তখন বলেছিলে, পরে বর দুটো চেয়ে নেবে। এখন দশরথের কাছে সেই বর দুটো চাও। বল, এক বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠান হোক। আর অপর বরে ভরতকে বসানো হোক অযোধ্যার সিংহাসনে।

কৈকেয়ীর কথাটা খুব মনে লাগলো। তিনি সমস্ত গহনা খুলে ফেলে একটা ময়লা কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে রইলেন। মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই অবস্থা দেখে খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কৈকেয়ী তোমার কি শরীর খারাপ? কৈকেয়ী কোন উত্তর দিলেন না। দশরথ অনেক রকম অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। বললেন, তোমার কি চাই বলো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যা চাইবে আমি তাই তোমাকে দেবো।

এই কথা শুনে কৈকেয়ী উঠে বসে বললেন, মহারাজ তুমি যখন অসুরদের সংগে যুদ্ধে আহত হয়েছিলে তখন আমি সেবাযত্ন করে তোমাকে সারিয়ে তুলেছিলাম। সেই সময় তুমি আমাকে দুটো বর দিতে চেয়েছিলে, আমি বলেছিলাম, পরে নেবো। আজ সেই দুটো বর আমি চাই। এক বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্যে বনে পাঠাও, অপর বরে ভরতকে করা হোক অযোধ্যার রাজা।

দশরথ এই কথা শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরলে

তিনি কৈকেয়ীকে অনেক রকম বোঝালেন। কিন্তু কৈকেয়ীর এককথা। দশরথ কাঁদতে কাঁদতে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

রামচন্দ্র এমন সময় হঠাৎ সেই ঘরে এসে হাজির হলেন। শুনলেন সব কথা। পিতৃসত্য পালনের জন্যে তাঁকে বনে যেতে হবে, তাতে আর দুঃখ কিসের। কারণ পিতার আদেশ তিনি কোনদিন অমান্য করেননি। তিনি বললেন, বাবা আপনি কোন চিন্তা করবেন না; আমি আজই বনে চলে যাবো।

রামচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমে মায়ের কাছে জানালেন এই কথা। কৌশল্যা পূজার ঘরে রামের জন্যে প্রার্থনা করছিলেন। তিনিও এই কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারপর সীতাকে গিয়ে বললেন এই কথা। সীতা বললেন, ঠিক আছে, আমিও তোমার সংগে যাবো। তাকে কিছুতেই নিষেধ করা গেল না। লক্ষ্মণ ব্যাপার শুনে প্রথমে খুব রেগে গেলেন। বললেন, বাবা বুড়ো হয়েছেন তাই ভীমরতিতে ধরেছে। পরে তিনিও নিজেকে সামলে নিলেন। জেদ ধরলেন, তিনিও রামের সংগে যাবেন।

মুহূর্তের মধ্যে কথাটা সারারাজ্যে ছড়িয়ে পড়লো, রাজ্যের প্রজাদেরও সব আনন্দ নিভে গেল। যে রাজবাড়ী একটু আগেও আনন্দ কলরবে মুখর হয়ে উঠেছিল, সেটা যেন হঠাৎ একটা মৃত্যুপুরী হয়ে গেল।

এবার যাবার সময় হয়েছে। সুমন্ত্র রথ সাজিয়ে আনলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে গাছের বাকল পরে রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা রথে চড়লেন। রথ চলতে লাগলো। বৃদ্ধ দশরথ, রাণীরা, রাজ্যের প্রজাবৃন্দ রথের সংগে রামকে শেষবারের মত দেখবার জন্যে ছুটতে

াগলো। তাদের কান্নার রোলে রামচন্দ্র আর ঠিক থাকতে পারলেন া। তিনি সুমন্ত্রকে বললেন, জোরে রথ চালাও। সুমন্ত্র জোরে থ ছুটিয়ে দিলো। মুহূর্তের মধ্যে রথ সকলের চোখের বাহিরে লে গেল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

দশরথ সেই যে এসে বিছানায় শুলেন আর উঠলেন না। কাঁদতে াঁদতে তাঁর চোখ দুটো অন্ধের মত হয়ে গেল। কিছুই দেখতে পান না। এদিকে অযোধ্যা শ্রীহীন হয়ে গেল। অযোধ্যার কোন াছে আর ফুল ধরে না। পাখীরা গান গাইতে ভুলে গেছে। সরযু নদীর সেই কুলকুল স্বরও যেন থেমে গেছে। সারা রাজ্যের লোক আনন্দহীন। গোটা অযোধ্যা রাজ্যও যেন রামের জন্যে সারাক্ষণ চোখের জল ফেলছে।

রামচন্দ্র প্রথমে শৃঙ্গবের পুরের কাছাকাছি, গঙ্গার ধারে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। সেখানকার রাজার নাম গুহক। তিনি ছিলেন রামের খুব বন্ধু। রামচন্দ্র এসেছেন শুনে গুহক ছুটে এলেন তাঁর কাছে। বললেন, তুমি এখানকার রাজা হয়ে বাস কর। কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃসত্যের কথা বলে তাকে অনেক বোঝালেন। কি আর করেন গুহক। কিছুতেই রামচন্দ্রকে রাজী করাতে পারলেন না। গুহকের চোখ দিয়েও জল ঝড়ে পড়লো। সে রাত্রি সেখানে কাটিয়ে পরের দিন গুহক আর সুমন্ত্রকে বিদার দিয়ে রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা গঙ্গা পার হলেন। খালি রথ নিয়ে মনের দুঃখে সুমন্ত্র ফিরে এলেন অযোধ্যা নগরে।

রাজপুত্র রামকে আর চেনাই যায় না। মাথায় তাঁর জটা। ারনে গাছের বাকল। হাতে ধনুক-বাণ। এসে হাজির হলেন

তাঁরা প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। মুনি তো খুব খুশী। আদর-যত্ন করে তাঁদের আশ্রমে জায়গা দিলেন। কিন্তু সেখানে লোকজনের ভীড় দেখে রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ত্যাগ করে চিত্রকূট পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন।

চিত্রকূট বড় মনোরম জায়গা। নির্জন বন, পাহাড় ঘেরা, বনে নানারকম ফলমূলের গাছ। ফুলগাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে মন্দাকিনী নদী বয়ে চলেছে ছলছল করে। সেই নদীর তীরে একটা ছোট্ট পাতায় ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা বাস করতে লাগলেন। কোন দুঃখকেই তাঁরা দুঃখ মনে করেন না। বনের ফলমূল খান। নদীর জলে তৃষ্ণা মেটান। গাছের পাতা আর ঘাসের বিছানায় রাত কাটান। এতেই তাঁদের মহা আনন্দ।

এদিকে সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরে আসতে দশরথ রামের কথা শুনে আবার কন্নায় ভেঙে পড়লেন। রাম চলে যাওয়ার পর থেকেই তিনি আর বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। এবার তাঁর দেহ অবশ হয়ে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে আবার তাঁর জ্ঞান লোপ পেল। হা! রাম, হা! রাম বলতে বলতে সেই রাত্রেই দশরথ মারা গেলেন। রামচন্দ্র বনবাসে যাবার পর মাত্র ছ'দিন তিনি বেঁচে ছিলেন।

সমস্ত অযোধ্যা আবার দুঃখে ভেঙে পড়লো। এ সময় ভরত আর শত্রুঘ্ন ছিলেন নন্দিগ্রামে, তাঁদের মামার বাড়ীতে। রাতে একটা ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখে ভরত সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। এমন সময় দূত এসে জানালো, শীগ্‌গির তাঁকে বাড়ী যেতে হবে। খবর পেয়ে ভরত ছুটে এলেন অযোধ্যায়।

বাড়ী এসে শুনলেন, দশরথের মৃত্যু সংবাদ। শোকে মর্মাহত

ভরত অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে যখন শুনলেন, রামকে বনে পাঠানোর জন্যে কৈকেয়ী কি জঘন্য চক্রান্ত করেছেন তখন রেগে অস্থির হয়ে বললেন, মা তুমি রাজার ঘরের মেয়ে হয়ে এত নীচ কি করে হলে! ছিঃ ছিঃ তুমি আমার বাবাকে হত্যা করে আমার পিতৃতুল্য দাদাকে তুমি বনে পাঠিয়েছ। তোমার নরকেও জায়গা হবে না। আজ কৈকেয়ী যদি তাঁর মা না হয়ে অন্য কেউ হতেন তাহলে ভরত হয়ত মেরেই ফেলতেন। কৌশল্যা ভরত এসেছেন শুনে ডেকে পাঠালেন। ভরত তাঁর কাছে এলে বললেন, এবার তুমি মনের সুখে রাজ্যভোগ কর আর আমাকে রামের কাছে বনে পাঠিয়ে দাও। ভরত কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত কথা খুলে বললেন। তারপর কৌশল্যার পা দুটো জড়িয়ে ধরে জ্ঞান হারালেন। কৌশল্যা বুঝলেন, ভরত কত নিরপরাধ। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কৌশল্যাও কাঁদতে লাগলেন। এদিকে শত্রুঘ্ন কুঁজি মন্থরাকে ধরে খুব প্রহার দিলেন। কোন রকমে শত্রুঘ্নের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাল।

বশিষ্ঠদেবের চেষ্টায় মহারাজ দশরথের শ্রাদ্ধশান্তি বিনা বাধায় চুকে গেল। আর দেখতে দেখতে তেরটা দিনও পার হয়ে গেল। রাজ্য চালাতে গেলে এবার একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। ভরতকেই রাজা করা হোক। না হলে রাজকার্য চলবে কি করে। কিন্তু ভরত কিছুতেই রাজা হবেন না। তিনি বললেন, দাদা থাকতে আমি রাজা হতে পারবো না। দাদা ফিরে এসে রাজা হোন। আমি তাঁকে ফিরিয়ে আনবো, এই বলে একদিন শত্রুঘ্নকে নিয়ে ভরত চললেন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে। সংগে চললো অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ, লোক-লস্কর, সেপাই-সান্ত্রী। রাণীমা আর পুরোহিতেরাও

বাদ গেলেন না। তারপর সেই বিরাটবাহিনী বনবাদাড় কাঁপি নানা নদীনালা পেরিয়ে এসে হাজির হোল গুহক রাজার দেশে প্রথকে গুহক ভাবলেন, ভরত বুঝি রামচন্দ্রকে মেরে ফেলতে এসেছেন তারপর যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন তখন তাঁর আনন্দ আর ধ না। পরের দিন সকলকে নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে গুহক তাঁদের নি এলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। ভরদ্বাজ মুনিও প্রথমে ভরতকে সন্দেহ করলেন। কিন্তু তিনি যখন ভরতের কাছ থেকে স জানতে পারলেন তখন তাঁদের রামচন্দ্রের খোঁজে কোন্ পথে যেতে হ তা বলে দিলেন।

অনেক পথ, হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন চিত্রকূ পর্বতে। ভরতকে দেখে লক্ষ্মণ প্রথমে একটু ভয়ে পেয়ে গিয়েছিলেন ভাবলেন, ভরত হয়ত তাঁদের মারতে এসেছেন। কিন্তু ভরত যখ কাঁদতে কাঁদতে রামের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন তখন তাঁরা বুঝলে ভরত কত নিরপরাধ। তারপর চার ভাই মিলে অনেক কাঁদলেন ভরত জানালেন, পিতার মৃত্যু সংবাদের কথা। কত কষ্ট পে তিনি পুত্রশোকে মারা গেছেন। অযোধ্যার সিংহাসন এখন শূন্য দাদা ছাড়া কে বসবেন সেই সিংহাসনে। কিন্তু রাম বললেন, তা হয় না ভাই, পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্যে আমি বনে এসেছি। এখ তো যেতে পারি না। তুমি এখন সিংহাসনে বস। চৌদ্দ বছ যেদিন শেষ হবে সেইদিনই আমি অযোধ্যায় ফিরে যাবো যখন কিছুতেই রাম ফিরতে রাজী হলেন না তখন ভরত বললেন তাহলে তোমার খড়ম দুটো আমাকে দাও। অমি মাথায় কে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে রাজকার্য চালাবো। অগত্যা রা

ভরতকে দিলেন তাঁর খড়ম জোড়া। সেই খড়ম জোড়া মাথায় নিয়ে তিনি চললেন। কী অপূর্ব দৃশ্য! পিছনে আসছে অজস্র লোকজন। ভরত বললেন, আমি রামহীন অযোধ্যায় আর ফিরে যেতে পারবো না।

ভরত সকলকে নিয়ে নন্দিগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে সিংহাসনের ওপর রামের খড়ম জোড়া রেখে ভরত ছাতা ধরে রাখতেন। এইভাবে রামের নামে তিনি রাজকার্য চালাতে লাগলেন। তিনিও ফলমূল খেয়ে দিন কাটান, গাছের ছাল পরেন। আর তৃণশয্যায় শয়ন করেন। ভরতের রামচন্দ্রের প্রতি এই রকম ভক্তি আর শ্রদ্ধা দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

অরণ্যকাণ্ড



সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম দণ্ডকবনে এলেন। দণ্ডকবনে ছিল অনেক মুনি ঋষির আশ্রম। এখানে রয়েছে বড় বড় গাছ, লতাপাতা, অজস্র অজানা ফুলের গাছ। এখানে এসেই প্রথমে রাম লক্ষ্মণ রাক্ষসের দেখা পেলেন। দেখলেন, একটা রাক্ষস সামনে বসে জীবজন্তু মেরে খাচ্ছে। কি বিকট চেহারা তার। দেহের গড়নটা তেমনি ভয়ংকর। চোখ দুটো তার লাল টকটকে। রাক্ষসটা তাদের দেখামাত্র ছুটে এসেই সীতাকে নিয়ে এক ছুট দিলো। রাম সংগে সংগে এক বাণ মারলেন, তখন সে ছুটে পালালো সীতাকে ফেলে দিয়ে। একটার পর একটা বাণ মেরে চলেছেন রাম আর লক্ষ্মণ। কিন্তু কি করবেন! কোন বাণই তার গায়ে লাগছে না।

রাক্ষসটা বললো, তোরা যত ইচ্ছে বাণ মার, আমার কিছুই হবে না। ব্রহ্মার বরে কেউ আমাকে মারতে পারবে না। তখন রাম লক্ষ্মণ তার হাত দুটোকে মুচড়ে ভেঙে একটা গর্তের মধ্যে পুঁতে দিলেন। তখন সে বললে, আমি আগে ছিলাম গন্ধর্ব। কুবেরের অভিশাপে আমি রাক্ষস হয়েছি। কুবের বলেছিল, রাম লক্ষ্মণের হাতে আমার মরণ হবে। তোমরা নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ ছাড়া আর কেউ নও।

এবার তাঁরা শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গেলেন, শরভঙ্গ মুনি এতদিন রাম লক্ষ্মণকে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। রামকে দেখে তিনি আগুন জ্বেলে তার মধ্যে গিয়ে বসে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

দণ্ডকবনে যে মুনির আশ্রমেই যান সেখানেই রাম লক্ষ্মণ খুব আদরযত্ন পান। এমনি করে দশটা বছর কেটে গেল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তাঁরা এসে হাজির হলেন অগস্ত্য মুনির আশ্রমে।

অগস্ত্য ছিলেন একজন মস্ত বড় মুনি। একবার তিনি ইল্বল আর বাতাপী নামে দুটো রাক্ষসকে মেরে ফেলেছিলেন। এই ইল্বল আর বাতাপী ছিল ভয়ানক দুষ্ট। বাতাপী ভেড়া সাজতো আর ইল্বল ব্রাহ্মণ সেজে মুনি ঋষিদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে সেই ভেড়ার মাংস রেঁধে খাওয়াতো। তারপর খাওয়া হয়ে গেলেই ইল্বল বাতাপীর নাম ধরে ডাকতো। সংগে সংগে বাতাপী মুনির পেট চিরে বেরিয়ে আসতো। এইভাবে অনেক মুনি ঋষিকে তারা মেরে ফেলেছিল।

এই ইল্বল একদিন অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করেছিল। তারপর খুব ভেড়ার মাংস খাইয়েছে। খাওয়া হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে

ইল্বল বাতাপীর নাম ধরে ডাকতে লাগলো। তখন অগস্ত্য বললেন, বাতাপী আর আসবে না, তাকে আমি হজম করে ফেলেছি। এই কথা শুনে ইল্বল যেই অগস্ত্যকে মারতে এসেছে অমনি অগস্ত্য ইল্বলকেও ভস্ম করে দিলেন। এইভাবে ইল্বল আর বাতাপী প্রাণ হারাল।

যাই হোক অগস্ত্য তো রামকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। তাকে অনেক অস্ত্র-সস্ত্র দিলেন। তারপর বললেন, তোমরা গিয়ে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে গিয়ে বসবাস কর। জায়গাটা তোমাদের খুব ভাল লাগবে।

রাম লক্ষ্মণ পঞ্চবটী বনে এসে হাজির হলেন, সত্যিই খুব মনোরম জায়গা। বারমাস সেখানে অজস্র রকমের ফুল ফুটে থাকে। নানারকম ফলের গাছও আছে। নদীতে হরিণেরা জল খেতে আসে। গাছের ডালে ময়ূর আনন্দে নাচে, কোকিল গান গায়। সেইখানে রাম সুন্দর একটা কুটীর তৈরী করে বাস করতে লাগলেন। কাছেই ছিল একটা গাছে জটায়ু পাখী। সে আবার ছিল মহারাজ দশরথের বন্ধু। এখন অবশ্য জটায়ু বুড়ো হয়েছে। গায়ে আর আগের মত সে-জোর নেই। সে সদাই তাঁদের খোঁজখবর নেয়। সুবিধে অসুবিধের কথা শোনে। খুব সুখেই দিনগুলো কাটতে লাগলো।

কিন্তু এত সুখও বোধ হয় সহ্য হোল না। হঠাৎ কোথা থেকে আবার একটা উৎপাত এসে হাজির।

একদিন সুর্পণখা নামে একটা রাক্ষসী এসে হাজির। সে আবার রাবণ রাজার বোন। এসেই সে রামকে বিয়ে করতে চাইল,

রাম রাজী হলেন না। তখন সে লক্ষ্মণকে গিয়ে ধরলো। লক্ষ্মণও রাজী না হওয়ায় সে সীতাকে গিলে খেতে গেল। তখন লক্ষ্মণ তার নাক আর কান কেটে তাড়িয়ে দিলেন। সেই বনে স্থূর্পণখার আর এক ভাই থাকতো, তার নাম খর। স্থূর্পণখা কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে হাজির হোল। খর স্থূর্পণখার এই অবস্থা দেখে ভীষণ রেগে গেল। তারপর দুষণকে সংগে নিয়ে কয়েক হাজার রাক্ষস সৈন্যসহ ছুটে এলো রাম লক্ষ্মণের সংগে যুদ্ধ করতে। তাদের চীৎকারে বন-জংগল কেঁপে উঠলো। তারপর ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই যুদ্ধে একে একে সব রাক্ষসই রাম লক্ষ্মণের হাতে মারা পড়ল, একমাত্র অকম্পন নামে একটা রাক্ষস কোন রকমে প্রাণ নিয়ে একেবারে লঙ্কায় পালিয়ে গেল। তারপর লঙ্কার রাজা রাবণকে বললো, জনস্থানে আর একটি রাক্ষসও নেই। সবাই রাম লক্ষ্মণের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। রাম লক্ষ্মণ যে-সে বীর নয়, তাদের হারায় সাধ্য কার। রাবণ তো একথা শুনে ভীষণ রেগে গেলেন, বললেন, আমি এখনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাচ্ছি। সামান্য মানুষ রাম লক্ষ্মণের এত সাহস, দেখাচ্ছি মজা। কিন্তু অকম্পন বললো, মহারাজ এক কাজ করুন, যুদ্ধ করে স্থবিধে হবে না। তার চেয়ে রামের বউ সীতাকে চুরি করে আনুন, তাহলেই সীতার শোকে ওরা মরে যাবে।

অকম্পনের কথাটা রাবণের বেশ মনে লাগলো। তিনি সংগে সংগে মারীচের কাছে গেলেন। কারণ এ ব্যাপারে মারীচ তাঁকে সাহায্য করতে পারে। আসলে মারীচ হচ্ছে একটা মায়াবী রাক্ষস। সে ইচ্ছেমত নানারকম জীবজন্তুর রূপ ধারণ করতে

পারতো। সেইজন্যে রাবণ মারীচকে সংগে নিয়ে পঞ্চবটী বনে এসে উপস্থিত হলেন।

পঞ্চবটী বনে এসে মারীচ একটা সুন্দর সোনার হরিণ সেজে রামের কুটীরের কাছে খেলা করতে লাগলো। এ-বন থেকে ও-বনে সে ছুটে বেড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে। সীতার দেখে খুব ভাল লাগলো। তিনি রামকে বললেন, হরিণটাকে ধরে দিতে। রামের কিন্তু মনে কি রকম একটা সন্দেহ হোল। তিনি ভাবলেন, এটা নিশ্চয়ই কোন মায়াবী রাক্ষস, কোন দুষ্ট মতলব নিয়ে এখানে এসেছে। তাই তিনি সীতাকে জেদ করতে বারণ করলেন। কিন্তু সীতার এক কথা, হরিণটাকে ধরে দিতে হবে। কি আর করেন রাম। অগত্যা তাঁকে হরিণটাকে ধরবার জন্যে যেতেই হলো। যাবার আগে তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি ভালভাবে কুটীর পাহারা দেবে। সীতাকে ছেড়ে যাবে না। এই বলে তিনি হরিণের পিছনে ছুটলেন। হরিণটাও তখন এ-বন ও-বন দিয়ে ছুটতে লাগলো। এদিকে লক্ষ্মণ তীর-ধনুক নিয়ে কুটীর পাহারা দিতে লাগলেন।

সোনার হরিণের পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে রাম একটা গভীর বনে এসে উপস্থিত হলেন। যখন দেখলেন, কিছুতেই হরিণটাকে ধরা যাচ্ছে না, তখন তিনি হরিণটাকে লক্ষ্য করে একটা বাণ ছুঁড়লেন। সংগে সংগে সোনার হরিণটা রামের মত গলার স্বর করে চীৎকার করতে লাগলো, হা! লক্ষ্মণ, হা! সীতা, আমাকে রক্ষা কর।

এই আর্তনাদ সীতার কানে এসে পৌছাতেই সীতা লক্ষ্মণকে বললেন, তাড়াতাড়ি যাও, রাম নিশ্চই বিপদে পড়েছেন। কিন্তু

লক্ষ্মণ বুঝলেন, এটা একটা চক্রান্ত। সীতাকে একা ফেলে গেলেই বিপদ হবে। তাই তিনি সীতাদেবীকে বললেন, দাদার কোন ক্ষতি হবে না। দাদাকে মারতে পারে এমন কেউ পৃথিবীতে নেই। আপনি শান্ত হন। আপনাকে একা ফেলে গেলে ভীষণ বিপদ ঘটবে।

কিন্তু সীতা লক্ষ্মণকে ভুল বুঝলেন। তিনি বললেন, ও বুঝেছি রামের সর্বনাশ হোক এটাই তুমি চাও।

সীতার মুখ থেকে এত বড় কথা শুনে লক্ষ্মণের খুব দুঃখ হোল, তিনি বললেন, আচ্ছা আপনি যখন বলছেন তখন যাচ্ছি। তবে একটা গণ্ডী টেনে দিয়ে গেলাম এর বাইরে আপনি যাবেন না। এই বলে লক্ষ্মণ যেই বনের আড়ালে চলে গেছেন ঠিক সেই সময় রাবণ এক সন্ন্যাসীর বেশে সীতার কুটীরের দুয়ারে এসে বললেন, মা ভিক্ষা দাও। সীতা সন্ন্যাসী দেখে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে ভিক্ষা দিতে গেলেন। তখন সন্ন্যাসী বললেন, মা গণ্ডীর ভিতরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে দিলে তো আমি নেবো না। কি আর করেন সীতা। সন্ন্যাসীকে শুধু হাতে ফেরাতে প্রাণ চাইলো না। তাই গণ্ডীর বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে গেলেন। আর সংগে সংগে সন্ন্যাসীর রূপ পাল্‌টে গেল, সীতা দেখলেন দশটা মাথা, ভীষণ মূর্তি রাবণ। সীতা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। রাবণ তখন চুলের মুঠি ধরে রথে তুলে সীতাকে নিয়ে ছুটলেন লঙ্কার দিকে।

গাছের ডালে বসে ঘুমুচ্ছিল থুথ্‌থুরে বুড়ো জাটায়ু পাখী। সীতার কান্নার শব্দে জেগে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, রথে করে রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। সংগে

সংগে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাবণের ওপর। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। জটায়ু রাবণকে আঁচড়ে কামড়ে হয়রান করে তুললো। কিন্তু জটায়ু বুড়ো হয়েছে। বেশীক্ষণ আর লড়াই করতে পারলো না। রাবণ তার হাতের খাঁড়া দিয়ে তার ডানা ছুটো কেটে ফেললো, সংগে সংগে জটায়ু মাটিতে রক্তাক্ত শরীরে লুটিয়ে পড়লো। সীতাকে রক্ষা করতে পারলো না। রাবণের পুষ্পক রথ তখন আকাশ পথে সোঁ সোঁ করে উড়ে চলেছে। সীতা নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো, এক পাহাড়ের চূড়ায় পাঁচটি বানর বসে রয়েছে চুপ করে। সীতা তাঁর চাদরখানি আর গহনাগুলো তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সীতা মনে করলেন, এই সমস্ত পেয়ে যদি বানররা রামকে কোনদিন খুলে বলে তাহলে হয়ত তাঁরা উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারবেন।

ওদিকে মারীচকে মেরে রাম কুটীরের দিকে ফিরবার সময় লক্ষ্মণের সংগে দেখা হয়ে গেল। লক্ষ্মণ তাঁরই সন্ধান করতে যাচ্ছিল। তিনি ব্যগ্র হয়ে বললেন, তুমি সীতাকে একলা কুটীরে ফেলে চলে এসেছো, তাহলে আর তাকে গিয়ে দেখতে পাবো না। কী সর্বনাশ! লক্ষ্মণ তখন সীতার কথা সমস্ত খুলে বললেন। কি আর করেন, ছুজনে ছুটতে ছুটতে কুটীরে এসে দেখলেন,—সব খালি, কোথাও সীতাকে খুঁজে পেলেন না।

বনের ভেতর দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে ছুই ভাই চলেছেন। অনেকটা পথ হেঁটে আসায় দেখতে পেলেন, জটায়ু পাখী রক্তাক্ত শরীরে পড়ে আছে। তার কাছে আসতেই জটায়ু বললো, লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি বাধা দেবার অনেক চেষ্টা

করেছিলাম। কিন্তু রাবণ আমার এই দশা করেছে। তোমাদের খবর দেবার জন্যেই আমি এতক্ষণ বেঁচে ছিলাম। এই কথা কটি বলেই জটায়ু প্রাণত্যাগ করলো।

জটায়ু মারা গেল। রাম লক্ষ্মণ তাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন। তারপর তার সৎকার করে ফিরছেন,—এমন সময় সমস্ত বন কেঁপে উঠলো। ভীষণ গর্জন শুরু হয়ে গেল। দেখলেন, গোদাবরী নদীর তীরে এক বনের ভেতর একটা রাক্ষস। অদ্ভুত তার চেহারা, তার মাথা নেই। পেটের ভেতরেই তার মুখ। আর দুটো ভাঁটার মত চোখ। একটা নীল পাহাড়ের মত বিরাট তার শরীর। তার নাম কবন্ধ। সে তো তার লম্বা হাত দুটো দিয়ে রাম লক্ষ্মণকে টপ করে ধরে ফললো। তখন রাম সংগে সংগে তার হাত দুটো কেটে ফেললো। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে বললো, তোমরা কে গো? তোমরা নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ। স্থূলশিরা মুনি বলেছিলেন, তোমাদের হাতেই আমি উদ্ধার পাবো। এককালে আমার খুব সুন্দর চেহারা ছিল। ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন, আমি অনেককাল বেঁচে থাকবো। কিন্তু একদিন দুর্বুদ্ধিবশতঃ স্থূলশিরা মুনিকে রাক্ষস সেজে ভয় দেখাতে গিয়েছিলাম। মুনি বুঝতে পেরে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তুই যেমন রাক্ষস সেজে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিস তেমনি রাক্ষস হয়েই থাক। অনেক কাঁদলাম, অনেক অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা চাইলাম। তখন তিনি বললেন, রাম এসে যখন তোর হাত দুটো কেটে ফেলে তোকে পুড়িয়ে ফেলবে তখনই তুই উদ্ধার পাবি। সুতরাং তুমি আমাকে এখন পুড়িয়ে ফেল তাহলেই আমি উদ্ধার পাবো।

তখন রাম লক্ষ্মণ প্রকাণ্ড একটা চিতা জ্বালিয়ে কবন্ধকে পুড়িয়ে ফেললেন। সবটা যখন পুড়ে গেল তখন চিতার ভেতর থেকে সুন্দর দেহ নিয়ে কবন্ধ চিতা থেকে বেরিয়ে এলো। আর সংগে সংগে আকাশ থেকে রথ নেমে এলো তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। রথে উঠবার সময় সে বলে গেল, তোমরা ঋষ্যমূক পাহাড়ে যাও। সেখানে সুগ্রীব নামে একটা বানর আছে। আর আছে তার চার সংগী। সুগ্রীবের ভাই বালী তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের ওপর তারা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। সেখানে গিয়ে সুগ্রীবের সংগে বন্ধুত্ব করো। তার সাহায্যে তোমরা সীতা উদ্ধার করতে পারবে।

এই কথা শুনে রাম লক্ষ্মণ পম্পা নদীর তীরে ঋষ্যমূক পাহাড়ের দিকে চললেন। বহু বন-জংগল নদ-নদী পেরিয়ে তাঁরা একদিন সেখানে এসে পৌছলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড



রাম লক্ষ্মণ এলেন ঋষ্যমূক পর্বতে। সুগ্রীব পাহাড়ের ওপর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, বোধ হয় বালী চর পাঠিয়েছে আবার তাদের খোঁজ করতে। সেইজন্যে সুগ্রীব হনুমানকে বললেন, যাও ওরা কে একবার খবর নিয়ে এসো। হনুমান সুগ্রীবের আদেশমত সেখানে এসে খোঁজখবর নিয়ে রাম লক্ষ্মণের সংগে দেখা করে বললেন, এখানকার রাজা সুগ্রীব আর আমি তাঁর মন্ত্রী। আপনারা কে? কোথা থেকে এখানে এসেছেন? আপনাদের দেখে তিনি আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামচন্দ্র হনুমানকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। লক্ষ্মণ বললেন, আমরা অযোধ্যার রাজা দশরথের ছেলে। উনি আমার বড় ভাই

রাম। আমরা বনবাসে এসেছিলাম। সংগে ছিলেন এঁর স্ত্রী সীতাদেবী। রাক্ষস তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে। খবর পেলাম, সুগ্রীব আমাদের সেই রাক্ষসের সন্ধান দিতে পারেন। তাই আমরা সুগ্রীবের সংগে দেখা করবার জন্যে এখানে এসেছি।

এই কথা শুনে হনুমান রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে গেলেন সুগ্রীবের কাছে। রামের পরিচয় পেয়ে সুগ্রীব খুব খুশী হলেন। তারপর দুজন অগ্নি সাক্ষী করে বন্ধুত্ব পাতালেন। বললেন, আজ থেকে আমরা দু'জনে দু'জনের সুখ-দুঃখের সাথী হলাম।

রাম বললেন, আমি বালিকে মেরে তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাব। সুগ্রীব বললেন, সীতাকে রাক্ষসরা যেখানেই লুকিয়ে রাখুক আমরা তাঁকে খুঁজে বের করে দেবো। আপনি এখন নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। এই কয়েকদিন আগে রাক্ষসরাজ রাবণ একটা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের দিকে কয়েকটা গহণা আর চাদর ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেগুলো আমরা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। সেগুলো একবার দেখুন তো। এই বলে সেগুলো রামচন্দ্রকে দেখালেন। সীতার চাদর আর গহণাগুলো দেখে রামচন্দ্র আবার শোকে অধীর হয়ে পড়লেন। তখন সুগ্রীব বললেন, বন্ধু দুঃখ কর না। সীতাকে আমরা নিশ্চয়ই এনে দেবো।

তারপর সুগ্রীব বললেন তাঁর দুঃখের কথা। তাঁর বড় ভাই বালী একবার একটা দানবের সংগে যুদ্ধ করতে সে পাতালে যায়। যাবার সময় সুগ্রীবকে বলে যায় সুড়ংগের মুখটা পাহারা দিতে। সে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু একটা বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন সুড়ংগের মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরতে লাগল। আমি

ভাবলাম, যুদ্ধে হয়ত দাদা মারা গেছেন। তাই সুড়ংগের মুখে একটা পাথর চাপিয়ে রেখে আমি রাজ্যে ফিরে এসে রাজা হয়ে বসলাম। এদিকে অসুরকে মেরে রাজ্যে ফিরে এসে দাদা দেখে, আমি রাজা হয়ে বসেছি। সংগে সংগে আমাকে মেরে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলো। আর তখন থেকে আমি ঋষ্যমূক পর্বতে আছি। কারণ আমার দাদা বালী এখানে আসতে পারে না। মাতঙ্গ মুনির অভিশাপ আছে কোনদিন যদি বালী এখানে আসে তাহলে পাষাণ হয়ে যাবে। নাহলে এখানে এসেই দাদা আমাকে মেরে ফেলতো।

তখন ঠিক হল সুগ্রীব একদিন গিয়ে বালীর সংগে যুদ্ধ বাঁধাবে। হলোও তাই। সুগ্রীব যেতেই বালী তেড়ে এলো। তারপর দু'জনে বাঁধলো ভীষণ যুদ্ধ। দু'জনেই দু'জনকে কিল, ঘুঁষি, লাথি মারতে লাগলো। মারের চোটে সুগ্রীবের শরীর রক্তারক্তি হয়ে গেল। মুখ দিয়ে রক্তবমি হতে লাগলো। রাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। কিছুই করলেন না। টলতে টলতে ফিরে এসে সুগ্রীব রামকে বললেন, এই তোমার বন্ধুর কাজ! আমি আধমরা হয়ে গেলাম, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে!

রাম বললেন, বন্ধু, আমি বালীকে বাণ মারবার জন্যে তৈরী হয়েছিলাম কিন্তু তোমাদের দু'জনের চেহারায় এমন মিল যে, আমি কিছুতেই কোন্‌টা তুমি ঠিক করতে পারলাম না। শেষকালে ভুল করে তোমাকে মেরে ফেলবো এই ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। তখন লক্ষ্মণ একটা লতাগাছ এনে মালা তৈরী করে সুগ্রীবকে পরিয়ে দিলেন। সুগ্রীব আবার বীরবিক্রমে বালীর সংগে যুদ্ধে করতে গেল। আবার ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেই সময় দূর থেকে রাম

বালীকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন। সংগে সংগে বাণটা বালীর বুক ভেদ করে চলে গেল। বালী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। রামচন্দ্র এতক্ষণ গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। এবার বেরিয়ে এলেন। তখন রামকে দেখে বালী বললেন, আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, তার মধ্যে তুমি এসে এতবড় অন্যায় কাজ করলে কেন? তোমার সংগে তো আমার কোন শত্রুতা নেই।

রাম বললেন, তুমি মহাপাপী। আর আমার বন্ধু সুগ্রীবকে আমি কথা দিয়েছি, তোমাকে মেরে তাকে সিংহাসনে বসাবো। সেইজন্যে তোমাকে মেরে আমার কোন অন্যায় হয়নি।

এদিকে বালীর বউ তারা আর পুত্র অঙ্গদ কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হোল। সেই দেখে রাম লক্ষ্মণের চোখেও জল এসে গেল। সুগ্রীব দাদার অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলো। বালী তাই মরবার আগে বললো, ভাই সুগ্রীব, এতকাল আমি তোমার প্রতি অনেক অন্যায় করেছি। আমি তো চললাম। তুমি সিংহাসনে বস। আর অঙ্গদকে তুমি দেখো। এই বলে মহাশক্তিধর বালী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

রাজবাড়িতে এসে সুগ্রীব সিংহাসনে রাজা হয়ে বসলেন আর অঙ্গদকে করলেন যুবরাজ। তারপর সীতাকে খুঁজবার কাজে লেগে গেলেন সকলে। সুগ্রীব দূত পাঠালেন চারিদিকে। বিনোদকে পাঠালেন পূর্বদিকে, হনুমানকে পাঠলেন দক্ষিণদিকে, শতাবলীকে পাঠালেন উত্তরদিকে আর অন্য একজন সেনাপতিকে পাঠালেন পশ্চিমদিকে। সকলকে বলে দিলেন, এক মাসের মধ্যে যদি তারা সীতার সন্ধান না আনতে পারে তাহলে তাদের প্রাণ থাকবে না

এদের মধ্যে হনুমানের বুদ্ধিসুদ্ধি ভাল। তাছাড়া সে সব জায়গায় যেতে পারে। সেইজন্যে হনুমানের হাতে রাম নিজের নাম লেখা আংটি দিয়ে বললেন, যদি সীতাদেবীর সন্ধান পাও, এই অংটিটা দেখাইও। তাহলেই তিনি তোমাকে আমার লোক বলে বুঝতে পারবেন।

হনুমানের দল তখনি বেরিয়ে পড়লো দিকে দিকে। তাদের দাপাদাপিতে পাহাড়-পর্বত বন-জংগল কেঁপে উঠলো। গেলো তারা কিরাতের দেশে, বাঘমুখো মানুষের দেশে। স্বর্ণ দ্বীপ, রৌপ্য দ্বীপও ঘুরে এলো। তারপর গেল লাল সমুদ্রে। তারপর কিন্নর-দেশ, গন্ধর্বদেশ, ক্ষীরোদ সমুদ্র, জলোদ সমুদ্র এমনকি সুমেরু পর্বত পর্যন্ত ছুটে গেল।

দিনরাত্রি খোঁজাখুঁজি করেও হনুমানের দল সীতার খোঁজ পেল না। একমাস প্রায় হয়ে এলো। সীতাদেবীর সন্ধান নিয়ে যেতে না পারলে আর প্রাণ থাকবে না। সকলে একে একে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসতে লাগলো। শুধু তখনো ফেরেনি অঙ্গদ, হনুমান আর জাম্ববান। তারা গিয়েছিল দক্ষিণদিকে।

একদিন অঙ্গদ, হনুমান আর জাম্ববান এসে সমুদ্র তীরে একটা গুহার ভেতর ঢুকে পড়লো। অদ্ভুত সুন্দর সে দেশ। জলে সোনার মাছ, সোনার গাছে সোনার ফুল, বাড়ি-ঘর সোনার। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। শুনলো, সেটা ময়দানবের পুরী, সেখানে ঢুকলে কেউ বেরুতে পারে না। বানরেরা তো মহা চিন্তায় পড়লো। বের হবার পথ খুঁজে পায় না। ঘুরতে ঘুরতে তারা এক তপস্বিনীর দেখা পেল। তখন তারা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর।

তপস্বিনী তাদের খেতে দিলেন। তারপর বললেন, তোমরা সকলে চোখ বন্ধ কর। আমি তোমাদের বাহিরে বের করে দেবো। তখন অঙ্গদ, জাম্ববান আর হনুমান চোখ বন্ধ করলো। খানিক পরে চোখ খুলে দেখলো, তারা একটা পাহাড়ের কাছে বসে আছে। দূর থেকে সমুদ্রের গর্জন তাদের কানে এলো। কোথায় যেন সমুদ্র আছে। আবার তারা চলতে শুরু করলো। পথে দেখা হলো জটায়ুর দাদা সম্পাতির সংগে। তার কাছ থেকে জানতে পারলো, সামনের ওই একশো যোজন চওড়া সমুদ্রের ওপারে লঙ্কা দ্বীপ। রাবণ রাজার সেটাই রাজ্য। রাবণ রাজা সীতাকে চুরি করে সেখানে নিয়ে গেছেন।

কিন্তু কি করে তারা সীতার কাছে পৌছবে? এতবড় বিশাল সমুদ্র পার হবে কি করে? কেউই এতটা লাফাতে পারে না। একমাত্র হনুমান পারলে পারে। অঙ্গদ তখন হনুমানকে বললে, তুমি ছাড়া যখন একাজ কেউ পারবে না তখন তুমি যাহোক একটা ব্যবস্থা কর।

হনুমান সব শুনে বললো, তাহলে চলো মহেন্দ্র পর্বতের দিকে। কারণ সেখান থেকেই লাফ দেওয়ার সুবিধা।

তখন সকলে মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হোল। সুন্দর জায়গা এই মহেন্দ্র পর্বত। কত গাছপালা, কত পশুপাখী, বাঘ, সিংহ। কিন্তু হনুমানদের লাফালাফি আর দাপাদাপিতে সমস্ত জীব-জন্তু গভীর বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। মনের আনন্দে বানরেরা মহেন্দ্র পর্বতের ওপরে উঠলো।

সুন্দরকাণ্ড



মহেন্দ্র পর্বতের ওপরে হনুমান প্রথমে শরীরটাকে ফুলিয়ে একটা বিশাল আকার ধারণ করলো, তারপর একলাফে সাগরের মাঝখানে এসে পড়লো। মৈনাক নামে সমুদ্রের তলায় আছে একটা বিরাট পাহাড়। সে হনুমানের কষ্ট লাঘব করার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়ালো, তখন সেই পর্বতের চূড়ায় একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ছুটতে লাগলো আকাশপথে।

এই সময় হনুমানের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে দেবতারা সুরসা নামে একটা সর্পিণীকে পাঠালেন। সে তখন রাক্ষসীর মত বিরাট হাঁ করে হনুমানকে গিলে খেয়ে ফেলবার চেষ্টা করলো। সে যত বিরাট হাঁ করে হনুমানও তত নিজেকে ফুলিয়ে ফেলতে লাগলো।

যখন পারলো না তখন হঠাৎ ছোট্ট আকার ধারণ করে সুরসার মুখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

এরপরই এলো সিংহিকা নামে একটা বিরাট জলজন্তু। সে হনুমানকে গিলবার জন্যে যেই হাঁ করে তেড়ে এলো তখন হনুমান আগের মতই হঠাৎ ছোট্ট হয়ে গিয়ে সিংহিকার হাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একেবারে পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর তার পেটের নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলো। তারপর আবার চলা শুরু করলো।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে সোনার লঙ্কাপুরী। ত্রিকূট পর্বতের গায়ে এই সোনার লঙ্কা চোখে পড়তেই হনুমান তার বিশাল দেহটিকে একেবারে বিড়ালের মত ছোট্ট করে ফেললো। তারপর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারিদিকে অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে লাগলো।

লঙ্কা যেন ইন্দ্রের অমরাবতী। কি তার রূপ! কি তার সৌন্দর্য। হনুমান যতই দেখেন ততই অবাক হন। পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গা হতে পারে হনুমান যেন তা কল্পনাই করতে পারছে না। এসব দেখবার এখন তার সময় নেই। সীতার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছে না।

হনুমান চারিদিকে সীতার খোঁজ করতে লাগলো। তারপর খুঁজতে খুঁজতে হাজির হোল অশোকবনে। একটা শিশুগাছের ওপর থেকে হনুমান দেখতে পেল এক গাছতলায় সীতা বসে আছেন। আর রাবণের চেড়ীরা তাকে পাহারা দিচ্ছে। তাদের চেহারা দেখলে ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে। তার ওপর হাতে রয়েছে তাদের নানারকম ধারালো

অস্ত্র-শস্ত্র। সীতা বসে বসে রামের নাম করে কাঁদছেন। তাঁর শরীর রোগা হয়ে গেছে। পোষাক হয়েছে মলিন। তিনি চুপ করে বসে আছেন। আর রাক্ষসীরা তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে।

এদিকে রাত গভীর হোল। চেড়ীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। হনুমান দেখলো— এই সুযোগ। সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এসে সীতাকে প্রণাম করে দাঁড়ালো। বললো, মা আপনি আমাকে রাবণের চর ভেবে ভয় পাবেন না। আমার নাম হনুমান। রামচন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার সংবাদ আনতে। এই বলে রামের হাতেব আংটিটা সে সীতাকে দেখালো। সেই আংটি দেখে সীতার আর কোন সন্দেহ রইলো না।

হনুমান বললো. মা আমি এখন কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে রামচন্দ্রকে খবর দিই। তবে যাবার আগে আপনি আপনার একটা চিহ্ন দিন যাতে রামচন্দ্র বিশ্বাস করেন। সীতাদেবী তখন তাঁর মাথার মণিটি খুলে হনুমানের হাতে দিলেন। মণি হাতে নিয়ে হনুমান সীতাকে প্রণাম করে চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে সে অশোকবনের গাছপালা ভেঙে ছারখার করে দিলো। তারপর সিংহ-দ্বারের মাথায় বসে সে মজা দেখতে গেল।

খবর গেল রাবণের কাছে। একটা ছোট্ট হনুমান চারিদিকে ভেঙেচুরে তছনছ করছে। নিশ্চই সে রামচন্দ্রের চর। সারা লঙ্কাপুরীতে হৈ-চৈ লেগে গেল। রাবণ হুকুম দিলেন, ধরে আন সেটাকে।

সংগে সংগে বড় বড় সব রাক্ষসেরা ঢাল, তলোয়ার, মুগুর, মুষল নিয়ে হনুমানের দিকে তেড়ে এলো মার মার শব্দে। হনুমান তখন

সিংহদরজার হুড়কো খুলে নিয়ে সবকটা রাক্ষসকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে ফেললো। তারপর একটা সুন্দর বাড়ি দেখে সেটাকেও ধ্বংস করে ফেললো। তখন মেঘনাদ ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়ে হনুমানকে বেঁধে ফেলে টানতে টানতে রাবণরাজার কাছে নিয়ে এলেন। রাবণ যখন শুনলেন, সে রামচন্দ্রের চর তখন ভীষণ রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন, হনুমানটার লেজে আগুন ধরিয়ে দাও।

এই আদেশ শুনে রাক্ষসদের মধ্যে ভীষণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। তখন তারা গাড়ী গাড়ী কাপড়, চট এনে তার লেজে জড়াতে লাগলো। লেজটা হয়ে উঠলো বিরাট মোটা। ন্যাকড়া জড়ানো হয়ে গেলে পিপে পিপে কেরোসিন তেল এনে ন্যাকড়ায় ঢালতে লাগলো। তারপর আনন্দে হৈ-হৈ করতে করতে লেজে দিলো আগুন ধরিয়ে এখন রাক্ষসদের আনন্দ দেখে কে। তারা উল্লাসে নাচতে লাগলো।

সকলে যখন অনন্দে মত্ত তখন হনুমান হঠাৎ শরীরটাকে ছোট করে ফেললো। সংগে সংগে বাঁধন গেল খুলে। তখন সে লাফ দিয়ে একটা রাজপ্রাসাদের ছাদে গিয়ে উঠে লঙ্কার বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো। দাউ দাউ করে সারা সহরে আগুন জ্বলে উঠলো। বড় বড় বাড়ি পুড়ে হুমদাম করে ভেঙে পড়তে লাগলো। গাঢ় ধোঁয়ায় পথঘাট দেখা যায় না। সংগে সংগে কে কোথায় যে পালালো তার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর সীতার কাছে গিয়ে বললো, মাগো তুমি কোন ভয় পেও না, আমরা আবার শীগগির আসবো। এই বলে সে সীতাকে প্রণাম

করে বিদায় নিলো। তারপর লেজের আগুন নিভিয়ে ফেলে অরিষ্ট পর্বতের চূড়ায় গিয়ে হাজির হোল। কারণ সেখান থেকে লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হওয়ায় সুবিধাজনক।

ওদিকে মহেন্দ্র পর্বতে অঙ্গদ, জাম্ববান আর অন্যান্য বানরেরা হনুমানের ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন আকাশে ঝড়ের মত সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল। হনুমানের গলার আওয়াজ ভেসে এলো। বানরেরা বুঝল, এবার নিশ্চয়ই হনুমান আসছে।

এমন সময় হনুমান লাফিয়ে পড়লো মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায়। হনুমানকে দেখে বানরদের আনন্দ আর ধরে না। তখন কেউ আনলো খাবার, কেউ দিলো আসন পেতে। কেউ এনে দিলো তৃষ্ণার জল। তারপর একটু জলখাবার খেয়ে সুস্থ হয়ে হনুমান তাদের কাছে খুলে বললো সীতার কথা। শেষকালে সীতার মাথার মণিটি দেখিয়ে বললো, এটি হচ্ছে মা সীতার মাথার মণি; রামচন্দ্রকে দেখাবো বলে এটি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

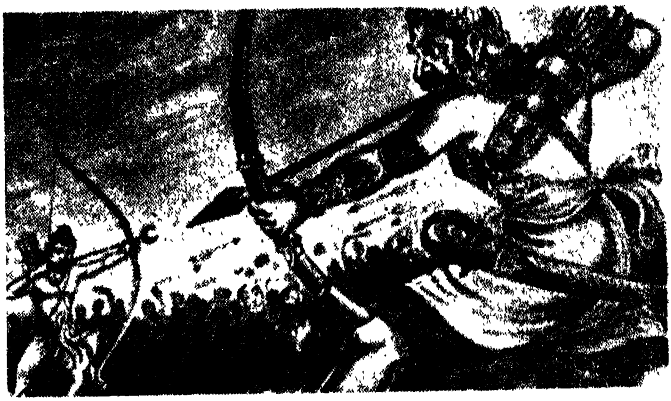
এরপর সকলে আনন্দে হুপ-হাপ, কিচির-মিচির শব্দ করতে করতে ফিরে চললো কিষ্কিন্ধ্যার দিকে। যাবার পথে তারা কিষ্কিন্ধ্যার কাছে সুগ্রীবের বাগান মধুবনে যে যত পারলো প্রাণ ভরে মধু খেলো। আনন্দে তাদের আর কোন কিছুরই খেয়াল নেই। আনন্দের আবেগে তখন তারা দিশাহারা।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন অঙ্গদ, জাম্ববান আর সব বানরেরা হনুমানকে সংগে নিয়ে সুগ্রীবের সামনে এসে উপস্থিত হোল। তারপর সুগ্রীবকে প্রণাম করে হনুমান বলতে লাগলো,

কিভাবে সে লঙ্কায় হাজির হয়েছিল; কিভাবে সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে. শেষে সীতার মাথার মণিটি বের করে রামচন্দ্রের হাতে দিলো।

সীতার মাথার মণিটি দেখে রামচন্দ্র সেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়লো অশ্রুধারা।

লঙ্কাকাণ্ড



এবার সীতাকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে রাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব মন্ত্রণা শুরু করে দিলেন। সুগ্রীব বললেন, কোন চিন্তা নেই। আমি হাজার হাজার বানর সৈন্য ব্যবস্থা করছি।

সংগে সংগে চারিদিকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হোল। চারিদিকে পড়ে গেল সাজ সাজ রব। হাজার হাজার বানর সৈন্য এসে হাজির হলো।

রাবণ গুপ্তচরদের মারফৎ শুনলেন, রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করতে আসছেন। রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তিনি দাদাকে বললেন, দাদা তুমি সীতাকে ফেরৎ দাও। তাতে লঙ্কার কল্যাণ হবে।

রাবণ এই কথা শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি বিভীষণকে কাপুরুষ বলে গাল দিলেন। তারপর লাথি মেরে রাজসভা থেকে

তাড়িয়ে দিলেন। বিভীষণ আর কি করেন। তাঁর স্ত্রী সরমাকে অশোকবনে সীতার কাছে রেখে চলে এলেন রামচন্দ্রের কাছে। রাম সব শুনে বললেন, রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণকেই লঙ্কার রাজা করা হবে। বিভীষণও রামকে সবরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র বানরসেনা নিয়ে সমুদ্রতীরে এসে হাজির। কিন্তু হাজার হাজার বানরসেনা নিয়ে কিভাবে সমুদ্র পার হবেন? তখন রাম সমুদ্রকে বশ করবার জন্যে সমুদ্র দেবতার অনেক স্তব করলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হোল না। তখন বললেন, দাঁড়াও, এত স্তব করলাম, তাতেও মন টললো না। এবার তোমায় মজা দেখাচ্ছি। এই বলে ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র জুড়লেন। ব্রহ্মাস্ত্রের ভয়ে জোড়হাত করে সমুদ্রদেব এসে হাজির হলেন রামচন্দ্রের কাছে। বললেন, আপনাদের দলে আছে বিশ্বকর্মার ছেলে নল। সে সমুদ্রে সেতু বাঁধলেই আপনারা অনায়াসে পার হতে পারবেন। আপনি দয়া করে ব্রহ্মাস্ত্র মারবেন না।

সংগে সংগে নল সেতু বাঁধবার ব্যবস্থা করলেন। বানরের দল কোমর বেঁধে লেগে গেল কাজে। গাছপালা, বড় বড় পাথর এনে তারা ফেলতে লাগলো সমুদ্রের মধ্যে। দিনরাত পরিশ্রম করে তারা সেতু বেঁধে ফেললো।

তারপর রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, নল, নীল, জাম্ববান প্রভৃতি বীরদের অধীনে হাজার হাজার বানরসেনা সেতুর ওপর দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কার উপকূলে উপস্থিত হয়ে লঙ্কা ঘিরে ফেললেন।

বানর সৈন্য লঙ্কা ঘিরে ফেলেছে। এই সংবাদ পেয়ে রাবণ

খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন রাক্ষস শিল্পী বিদ্যুৎ-জিহ্বাকে দিয়ে অবিকল রামের মত একটা কাটামুণ্ড তৈরী করিয়ে সীতাকে দেখালেন। সীতা রাবণের হাতে রামের মৃত্যু হয়েছে ভেবে কাঁদতে লাগলেন। আর বেঁচে থেকে তাঁর কি লাভ। এবার তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

রাবণ চলে গেলে বিভীষণের স্ত্রী সরমা সীতাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, এখনো রাম রাবণের যুদ্ধই শুরু হয়নি। তুমি উতলা হয়ো না। রাবণের ক্ষমতা নেই রামচন্দ্রকে বধ করে। আর রামের কাটামুণ্ডটা আসল মুণ্ড নয়। ওটা রাক্ষসের তৈরী মায়ামুণ্ড। সীতাদেবী সরমার এই কথা শুনে শান্ত হলেন।

রামের শিবিরে পরের দিন যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। নলের ওপর ভার পড়লো লঙ্কার পূর্ব দরজা রক্ষার। অঙ্গদের ওপর ভার পড়লো দক্ষিণ দরজা রক্ষার। রাম লক্ষ্মণ নিজে রইলেন পশ্চিম দরজায়। বীর হনুমান রইলেন তাঁদের সংগে। আর উত্তর দরজা রক্ষার ভার রইলো বানররাজা সুগ্রীবের ওপর।

রামের সৈন্যরা ছিল সুবল পর্বতের ওপর। সেখান থেকে লঙ্কাপুরীর সমস্তই দেখা যায়। সেখান থেকে দেখা গেল রাবণ নিজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লঙ্কার উত্তর দরজায়। তাঁর দশ মাথায় দশটা সোনার মুকুট। গলায় দুলছে গজোমতির মালা।

রাবণকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুগ্রীব একলাফে সুবল পর্বতের ওপর থেকে রাবণের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লো। তারপর মাথার মুকুট খুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে শুরু করে দিল কিল, চড়, ঘুঁষি। কিছুক্ষণ পর আবার একলাফে চলে এলো

সুবল পর্বতের ওপর। ভীষণ অপমানে রাবণরাজার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

ওদিকে রাবণরাজা মন্ত্রণা সভায় বসেছেন। এমন সময় রামের দূত হয়ে হাজির হোল বালির ছেলে অঙ্গদ। সে এসে বললো, আমি বালিরাজার ছেলে অঙ্গদ। চুপচাপ বসে কেন? এসো বাইরে। যুদ্ধ কর। রাবণ তো তাকে দেখেই রেগে আগুন। তার স্পর্দ্ধা দেখে হুকুম দিলেন, ওটাকে কেটে ফেল তো। হুকুম পাবার সংগে সংগে চারটে রাক্ষস এসে তাকে চেপে ধরল। আর অমনি অঙ্গদ রাক্ষস চারটেকে বগলে চেপে ধরে একলাফে গিয়ে উঠলো ছাদের ওপর। তারপর একলাথি মেরে ছাদ উড়িয়ে দিয়ে রাক্ষস চারটেকে আছড়ে মেরে দিয়ে রামের কাছে এসে হাজির হোল। এরপরে আর যুদ্ধ না হয়ে যায় না। রাক্ষসেরা নানা রকম অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে এলো। আরম্ভ হয়ে গেল ঘোরতর যুদ্ধ। যেমন মারা যেতে লাগলো রাক্ষসের দল, তেমনি মারা পড়তে লাগলো বানরের দল। চতুর্দিকে শুধু অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ আর কান্নার রোল। রক্তের স্রোত বইতে লাগলো, মৃতদেহের স্তূপ হয়ে উঠলো পাহাড়ের মত।

এমন সময় রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ এলেন যুদ্ধ করতে। শিব বর দিয়েছিলেন, ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে পারবে; কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেই অঙ্গদ একলাথিতে রথ-সারথি, ঘোড়া সব ব্যাঙচ্যাপ্টা করে দিলো। তখন বেগতিক দেখে মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ শুরু করে দিলো। তিনি রাম লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে যেই নাগপাশ বাণ মারলেন,

অমনি হাজার হাজার সাপ এসে রাম আর লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরলো। রাম লক্ষ্মণ নাগপাশ বাণে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে সকলে একসংগে হাহাকার করে উঠলো। ইন্দ্রজিৎ তখন গিয়ে রাবণকে বললো, আর ভয় নেই, আমি লক্ষ্মণকে শেষ করে এসেছি। রাবণের তখন হাসি আর ধরে না।

এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠলো। সাপ যাকে দেখে ভয়ে পালায়, ডানা ঝাপটে সেই গরুড় এসে হাজির। সে রাম লক্ষ্মণের গায়ে হাতে বুলিয়ে দিতেই রাম লক্ষ্মণ আবার সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। সংগে সংগে বানররা আবার আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

রাক্ষসরা ছুটে এসে রাবণকে সংবাদ দিলো, রাম লক্ষ্মণ আবার বেঁচে উঠেছেন। এই কথা শুনে রাবণের দশ মাথার বিশটা চোখ কপালে উঠে গেল। কি আর করেন রাবণ। রাম লক্ষ্মণকে মারবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন ধূম্রাক্ষ নামে একটা রাক্ষসকে। সংগে এলো হাজার হাজার রাক্ষস।

আবার ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বানরের দল রাক্ষসদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাদের ঘাড় মটকে দেয়। কামড়ে খামচে অস্থির করে তোলে। তখন গদা হাতে ধূম্রাক্ষ ছুটে গেল হনুমানের দিকে। হনুমান তখন একটা পাহাড়ের চূড়া ছুঁড়ে ধূম্রাক্ষের মাথা গুঁড়ো করে দিলো।

এইভাবে বড় বড় রাক্ষস সেনাপতিরা যুদ্ধ করতে এসে মারা পড়লো। এরপর এলেন ইন্দ্রজিৎ। রাবণের আর এক ছেলে অতিকায়, মহোদয় এলেন হাতিতে চড়ে। লাল একটা ঘোড়ায় চড়ে

এলেন পিশাচ। ষাঁড়ে চড়ে শূল হাতে ত্রিশিরা, কুম্ভ, নিকুম্ভ সকলের সংগে রাবণ এসে হাজির হোলেন।

রাবণকে দেখেই সুগ্রীব সংগে সংগে একটা পাহাড় ছুঁড়ে মারলো। রাবণও কম যান না। তিনি সুগ্রীবকে এমন একটা বাণ মারলেন যে, সুগ্রীব সংগে সংগে অজ্ঞান হয়ে গেল। ওদিকে শুরু হয়ে গেল হনুমান ও রাবণের ভীষণ মারামারি। কিছুক্ষণের মধ্যে হনুমান এত কাহিল হয়ে পড়লো যে, সে আর দাঁড়াতে পারলো না। কোন রকমে টলতে টলতে পালিয়ে গেল। এরপর শুরু হোল রাবণ আর লক্ষ্মণে ভীষণ যুদ্ধ। একবার রাবণ লক্ষ্মণকে বাণ মারে লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে যায়, জ্ঞান ফেরার পর সংগে সংগে সে রাবণকে বাণ মারে রাবণ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এইভাবে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হলো। শেষে রাবণ এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে, আর দাঁড়াতে পারলেন না। লজ্জায় মাথা হেঁট করে তাড়াতাড়ি লঙ্কাপুরীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

মহাচিন্তায় পড়েছেন রাবণ। এখন কুম্ভকর্ণ ছাড়া আর গতি নেই। সে রাবণের ভাই। সে মায়ের পেট থেকে পড়েই এত সব জীব-জন্তু খেতে লাগলো যে, সকলের খুব ভয় হোল। ছোটবেলাতেই যার এই অবস্থা বড় হলে সে না জানি কি হয়ে উঠবে। সকলে তখন গিয়ে হাজির হোল ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে কুম্ভকর্ণের ওপর বসিয়ে দিলেন এক ঘা। সংগে সংগে কুম্ভকর্ণও ঐরাবতের দাঁত ভেঙে নিয়ে ইন্দ্রকে দিলো আচ্ছা প্রহার। কুম্ভকর্ণের এই রকম উৎপাত দেখে ব্রহ্মা বললেন, তোমার বাপু আর জেগে থেকে কাজ নেই, তুমি দিনরাত ঘুমিয়ে থাকো। রাবণ তখন ব্রহ্মার কাছে এসে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন। তখন ব্রহ্মা

লেলেন, ঠিক আছে এখন থেকে ও ছ'মাস ঘুমুবে আর একদিন জেগে াকবে। সেই সর্বনেশে কুম্ভকর্ণ এখন ঘুমিয়ে রয়েছে।

একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে ছিল কুম্ভকর্ণের ঘুমোবার ঘর। ৎওয়ালে তার বিচিত্র রকমের কারুকার্য। সারা গুহাটা সোনায় মাড়া। কুম্ভকর্ণ যখন ঘুমাতো তখন নাক ডাকতো মেঘের গর্জনের ত। নিঃশ্বাস বইতো যেন সাইক্লোন ঝড়। তার নিঃশ্বাসের সামনে ধই যেতো সেই ছিটকে পড়তো একশো হাত দূরে।

সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাতে হবে। তবে জেগে উঠলেই সে াই খাই করবে। আর সামনে যাকে পাবে তাকেই টপাটপ থয়ে ফেলবে। সেইজন্যে পাশেই রাখা হয়েছে লক্ষ লক্ষ পশুর াংস, হাজার হাজার পাত্র পানীয়। তারপর ঘুম ভাঙাবার জন্যে াক্ষসের দল ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, শাঁক বাজাতে লাগলো; াতেও তার ঘুম ভাঙে না। তখন লক্ষ লক্ষ রাক্ষস মুগুর, কুড়াল ত্যাদি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। বড় বড় হাতী এনে বুকের পের দিয়ে ছুটিয়ে দেওয়া হোল। নাকের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হাল বড় বড় শালগাছ, তালগাছ। তখন ভয়ঙ্কর হাঁচি দিয়ে জগে উঠলো কুম্ভকর্ণ। উঠেই যা খাদ্য ছিল নিমেষের মধ্যে িঃশেষ করে ফেললো। তারপর শুধালো, হঠাৎ অকালে আমার ম ভাঙালে কেন? সব ভাল তো? মন্ত্রী যূপাক্ষ দাঁড়িয়ে ছিলো াশে। সে বললো, খবর খুব খারাপ। বানর আর মানুষে সোনার ঙ্কা ছারখার করে ফেললো। শুনে কুম্ভকর্ণ বললেন, বটে এত ড় স্পর্ধা। দাঁড়াও আগে সেগুলো খেয়ে ফেলি তারপর দাদার ংগে গিয়ে দেখা করবো। কিন্তু মন্ত্রী বললো, কর্তা, তার

আগে একবার রাজামশায়ের সংগে দেখা করলে ভাল হোত না?

সব শুনে কুম্ভকর্ণ রাবণের সংগে দেখা করতে গেলো। রাবণ বললেন, তুমি তো দিনরাত ঘুমোও। খবর তো কিছুই রাখ না। সোনার লঙ্কাটা ছারখার হয়ে গেল। সেইজন্যে তোমায় জাগিয়েছি। তুমি একটা যাহোক ব্যবস্থা কর।

রাবণের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ বললেন, তখনি বলেছিলাম এসব অন্যায় কাজ ভাল না। বিভীষণও ওই কথা বলেছিল বলে তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেন, এখন বুঝুন ঠ্যালা।

কুম্ভকর্ণের কথায় রাবণ খুব রেগে গেলেন। বললেন, তুমি ছোট ছোটর মত থাক, যা বলছি এখন তাই করবার চেষ্টা কর।

কুম্ভকর্ণ বললেন, ঠিক আছে, আমি এখনি গিয়ে ওদের মেরে ফেলছি। এই বলে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধের পোষাক পড়তে লাগলো, তারপর লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করতে গেল।

কুম্ভকর্ণ হাতে একটা শূল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লো। তার সেই ভীষণ চেহারা দেখে বানরেরা যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। কোন বানরসেনা তার সামনে যেতে চায় না। ছোট ছোট বানরগুলো তো আরো ভয় পেয়ে গেল কারণ কুম্ভকর্ণ তাদের পেলেই টপাটপ খেয়ে ফেলছিল।

তখন বড় বড় বানরেরা পাহাড়ের চূড়া, পাথর, গাছ দিয়ে বহু রাক্ষস মেরে ফেললো। শেষে হনুমান একটা বিরাট পাহাড়ের চূড়া ছুঁড়ে দিলো কুম্ভকর্ণের বুক লক্ষ্য করে। সেই আঘাতে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো কুম্ভকর্ণ। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা শক্তিশেল ছুঁড়লো হনুমানের দিকে। তার

আঘাতে হনুমানের একেবারে চোখ কপালে উঠে গেল। কিছুক্ষণ সে বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল।

সকলেই ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে, কুম্ভকর্ণের সংগে কেউ পেরে উঠছে না। কুম্ভকর্ণ একটা পাহাড় ছুঁড়ে মারলো সুগ্রীবকে। সুগ্রীব সেই আঘাতে উল্টে পড়ে গেল। সংগে সংগে কুম্ভকর্ণ তাকে তুলে নিয়ে লঙ্কাপুরীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সুগ্রীব লঙ্কাপুরীর উঠোনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাক্ষসদের তখন আনন্দ দেখে কে! এমন সময় সুগ্রীব একলাফে উঠে পড়েই এক কামড়ে কুম্ভকর্ণের অর্ধেকটা নাক আর আঁচড়ে কান ছুটোকে ছিঁড়ে নিলো! এমন সময় হাজার হাজার বানর একসংগে পিটতে আরম্ভ করলো কুম্ভকর্ণকে। কুম্ভকর্ণ তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতেই ছুটে গেল, প্রথমে সুগ্রীবকে মারলো এক আছাড়। তারপর বানরদের ধরে টপাটপ খেয়ে ফেলতে লাগলো। বানররা এখন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, লক্ষ্মণ ছুটে এলেন কুম্ভকর্ণের সংগে যুদ্ধ করতে।

কুম্ভকর্ণ তখন লক্ষ্মণকে বললো, তুমি তো নিতান্ত ছুধ খাওয়া ছেলে। তোমার সংগে আমি যুদ্ধ করবো না। এই বলে উপস্থিত হলেন রামের কাছে।

তখন রাম আর কুম্ভকর্ণের সংগে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। একটার পর একটা ভীষণ বাণ মারতে আরম্ভ করলেন রাম। কিন্তু কুম্ভকর্ণের কিছুই গায়ে লাগে না। সে তখন মুগুর ঘুরিয়ে হাজার হাজার বানরকে মেরে ফেলতে লাগলো। তখন রাম বায়ুবাণ মেরে কুম্ভকর্ণের হাত ছুটোকে কেটে ফেললেন। তারপর অর্ধচন্দ্র

বাণ মেরে তার পা দুটো এবং ইন্দ্রবাণ মেরে মাথাটা কেটে ফেললেন কুম্ভকর্ণ মারা গেল।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হওয়ার সংগে সংগে রাক্ষসপুরীতে হাহাকা পড়ে গেল। রাবণের মত বীরও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো আজ রাবণ বুঝতে পারলো, সে সীতাকে চুরি করে এনে কত ব অন্যায় করেছে।

আবার যুদ্ধক্ষেত্রে এলো ইন্দ্রজিৎ। সে ঠিক করলো, এবার সে নিজেই প্রাণপণে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ শুরু হলো, এরকম যুদ্ধ এর আগে আর কেউ দেখেনি। সে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতো তার ফলে কোথা থেকে সে বাণ মারতো তা' কেউই দেখতে পেতো না। দলে দলে বানর মারা পড়তো লাগলো। চারদিকে বানরদের মধ্যে হাহাকার উঠলো। ওদিকে রাক্ষসরা আনন্দে বুক ঠুকে লাফায়।

এমন সময় ইন্দ্রজিৎ দুটো এমন সাংঘাতিক বাণ মারলো যে, রাম লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কান্নার রোল উঠলো বানর-সেনাদের মধ্যে। তখন জাম্ববান এসে হনুমানকে বললো, দেখো বসে বসে কাঁদলে হবে না। ঋষভ পাহাড়ে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ-করণী, মৃতসঞ্জিবনী আর সন্ধ্যানী নামে চারটে ওষুধের গাছ আছে. নিয়ে এসো, তাহলে রাম লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবেন।

হনুমান সংগে সংগে মারলো একলাফ। হাজির হলো ঋষভ পর্বতে। কিন্তু একটা গাছও সে চিনতে পারলো না। তখন সে পাহাড়টাকেই একেবারে উপড়ে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে হাজির। ওষুধের গন্ধ নাকে যেতেই রাম লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। বানররা তখন জয় রামজী ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়ে ফেলতে লাগলো।

ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করবার আগে একটা যজ্ঞ করতো. তার নাম নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ না হলে সে মেঘের আড়ালে লুকোবার ক্ষমতা পেতো না। কিন্তু বানররা এমন একটুও সময় দেয় না যাতে সে কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে যজ্ঞটা করে নেয়। শেষে সে একটা নকল সীতা তৈরী করে নিয়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের সামনে সেটা কেটে ফেললো। সংগে সংগে রাম লক্ষ্মণ আর বানর সেনারা কাঁদতে শুরু করে দিলো। কিন্তু বিভীষণ সমস্ত ব্যাপারটা যে মিথ্যা সেটা বুঝিয়ে দেবার পর সকলে শান্ত হোল।

ইন্দ্রজিৎ সেই অবসরে যজ্ঞ করতে বসেছে। ঠিক সেই সময় বিভীষণকে সংগে নিয়ে লক্ষ্মণ হাজির হোল যজ্ঞাগারে। সংগে আছে হনুমান। যে রাক্ষসটা দরজায় পাহারা দিচ্ছিল হনুমান প্রথমেই তাকে মারলো এক আছাড়। তারপর যাকে পায় তাকেই হনুমান আছড়ে মেরে ফেলে। এ রকম বিপদে ইন্দ্রজিৎ আর যজ্ঞ করতে পারলো না। শুরু হয়ে গেল ভয়ংকর যুদ্ধ। রক্তের স্রোতে চারদিক থৈ-থৈ করছে। আহতদের চিৎকারে আকাশ কেঁপে উঠলো। বানর আর রাক্ষস যে কত মারা গেল তার আর ঠিক নেই। রথের ওপর থেকে যুদ্ধ করে ইন্দ্রজিৎ আর লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠের ওপর থেকে বাণ মারেন। দু'জনেরই দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। এমন সময় একটা বাণ মেরে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের রথের ঘোড়া আর সারথিকে কেটে ফেললেন। কি করেন ইন্দ্রজিৎ। তিনি রথ থেকে নেমে এসে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই সময় লক্ষ্মণ ইন্দ্র অস্ত্র ছুঁড়ে ইন্দ্রজিতের মাথা কেটে ফেললেন।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে মারা গেছে শুনে লঙ্কাপুরীতে কান্নার রোল

উঠলো। রাবণ বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলো। লঙ্কা এখন বীরশূন্য। কে এখন যুদ্ধ করবে? তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন রাবণ। বললেন, ইন্দ্রজিৎ নকল সীতাকে কেটে ছিল। এবার আমি আসল সীতাকে কেটে ফেলবো। মন্ত্রীরা অনেক বুঝিয়ে তাকে শান্ত করলো। তখন রাবণ বললেন, ঠিক আছে তোমরা আজ যুদ্ধ করে রাম লক্ষ্মণকে কাবু করে ফেল। কাল আমি গিয়ে তাদের একেবারে শেষ করে দেবো।

এবার মন্ত্রীরা রাক্ষস সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এলো। আবার ভীষণ যুদ্ধ শুরু হোল। কিন্তু রামের সংগে রাক্ষসেরা আর পেরে উঠছে না। মহা বিপদে পড়লো তারা। রাম বাণ মেরে লক্ষ লক্ষ রাক্ষসসেনা মেরে ফেললো। শেষে মাত্র কয়েকটি রাক্ষস কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো।

বিশাল লঙ্কাপুরীতে এখন রাবণ ছাড়া আর কেউ নেই। মাত্র কয়েকটি রাক্ষস সৈন্য নিয়ে এবার তিনি নিজে এলেন যুদ্ধ করতে। ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হোল দু'পক্ষে। রাবণ এমন বীর বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করলেন যাঁর সামনে কেউ আর দাঁড়াতে পারে না। তখন রাম লক্ষ্মণ এগিয়ে এলেন। লক্ষ্মণ প্রথমেই একটা বাণ মেরে রাবণের ধনুক কেটে ফেললেন। তখন একটা প্রকাণ্ড শক্তিশেল লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন রাবণ। সেটা লক্ষ্মণের বুকে লাগার সংগে সংগে লক্ষ্মণ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বানরের দল ছুটে এলো লক্ষ্মণের বুক থেকে শক্তিশেল খুলে নেবার জন্যে। কিন্তু রাবণ এমন বাণ ছুঁড়তে লাগলেন যে, কেউ আর লক্ষ্মণের কাছে এগুতে পারে না। তখন রাম ছুটে এসে নিজে লক্ষ্মণের বুক থেকে শক্তিশেল

টেনে খুলে দিলেন। তারপর রাবণের দিকে এমন একটা বাণ মারলেন যে, রাবণ ছুটে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন।

রাম তখন লক্ষ্মণকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। আজ যদি লক্ষ্মণ মারা যায় তাহলে তিনি কিভাবে অযোধ্যায় ফিরে যাবেন; কিভাবে প্রজাদের কাছে মুখ দেখাবেন? হনুমান তখন রামকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে ওষুধ আনতে আবার ঋষভ পাহাড়ে চলে গেল। কিন্তু এবারও ওষুধের গাছ চিনতে পারলো না। তখন আবার সেই গাছশুদ্ধ পাহাড়টাকে মাথায় করে নিয়ে এসে হাজির করলো। ওষুধের গন্ধে লক্ষ্মণ আবার সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন।

এমন সময় রাবণ আবার ছুটে এলেন যুদ্ধ করতে। ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। এমন সময় ইন্দ্র রামকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর রথখানা। সেই রথে চেপে রাম যুদ্ধ করতে লাগলেন। রাবণ ইন্দ্রের রথের ঘোড়া দুটোকে বাণ মেরে কেটে ফেললেন। বাণে বাণে রাম অস্থির হয়ে উঠলেন। সে কি ভয়ানক যুদ্ধ। আকাশের এক দিকে দেবতা আর একদিকে অসুররা জড়ো হয়েছেন রাম রাবণের যুদ্ধ দেখবার জন্যে। এমন ভীষণ যুদ্ধ স্বর্গ মর্ত্য পাতালে কেউ কখনো দেখেনি।

রাম বাণ মেরে রাবণের একটা মাথা যেই কেটে ফেলেন, সংগে সংগে সেখানে আর একটা মাথা গজিয়ে ওঠে। তখন ইন্দ্রের সারথি মাতলি রামচন্দ্রকে বললেন, আপনি ব্রহ্মাস্ত্র মারুন, না হলে রাবণকে মারতে পারবেন না।

তখন রাম অগস্ত্য মুনির দেওয়া ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়লেন। সমস্ত পৃথিবী সংগে সংগে অন্ধকার হয়ে গেল। জীব-জন্তু, পশু-পাখী যে যেদিকে পারলো প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাল। ব্রহ্মাস্ত্র

একেবারে রাবণের বুক ফুঁড়ে মাটিতে গিয়ে বিঁধলো। এবার সত্যিই রাবণ মারা গেল।

রাবণের মৃত্যুর সংগে সংগে বানরেরা রামের জয়ধ্বনি দিয়ে আনন্দে লাফাতে লাগলো। স্বর্গে বেজে উঠলো দেবতাদের দুন্দুভি। দেবতারা আকাশ থেকে রামচন্দ্রের মাথায় পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন। অন্ধকার হয়ে গেল রাবণের সোনার লঙ্কা। শেষে রেশমী কাপড় ঢাকা দিয়ে সকলে মিলে রাবণের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। তারপর রাবণকে পুড়িয়ে এসে রামচন্দ্র বিভীষণকে বসালেন লঙ্কার সিংহাসনে।

এমন সময় সীতাকে গিয়ে রাবণের মৃত্যু সংবাদ দিলো হনুমান। কিন্তু সীতা তখন হতবুদ্ধির মতো তাকালেন হনুমানের মুখের দিকে। কি বলবেন তাকে? শুধু হনুমান যখন রাক্ষসীগুলোকে মারতে গেলো তখন সীতা তাকে নিষেধ করলেন। বললেন, ওদের কোন দোষ নেই। ওরা শুধু আদেশ পালন করেছে। ওদের ছেড়ে দাও। সীতার দয়ায় রাক্ষসীরা প্রাণে বাঁচলো।

তারপর সীতা এসে হাজির হলেন রামচন্দ্রের কাছে, বহুদিন পরে দেখা। জীবনে আর রামচন্দ্রের দেখা পাবেন এ তিনি ভাবেননি। আনন্দে তাঁর হৃদয় উথলে উঠলো।

কিন্তু সীতার কি কপালে সুখ আছে! রাম সীতাকে দেখে বললেন, তুমি বহুকাল রাক্ষসের ঘরে কাটিয়েছ। আমার ওপর হয়ত আর আগের মত টান নেই। আমার কর্তব্য আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি। এবার তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো।

রামের মুখের এই কঠিন কথা শুনে আর থাকতে পারলেন না।

এতখানি আঘাত রামচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি আশা করেননি। তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি চিতা সাজিয়ে দাও। তাতে আমি প্রাণ বিসর্জন দিই। আর আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

লক্ষ্মণও রামের কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। সংগে সংগে তিনি চিতা সাজিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। আর সীতা ঝাঁপ দিলেন সেই আগুনের মধ্যে।

কিন্তু সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো, সেই আগুন সীতাকে বিন্দুমাত্র ছুঁতে পারলো না। সীতাকে কোলে নিয়ে অগ্নিদেব বাহিরে এসে দাঁড়ালেন। অগ্নিদেব বললেন, রাম, সীতাকে ঘরে নিয়ে যাও। তার কোন দোষ নেই। এই বলে তিনি আবার আগুনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। রামও আনন্দের সংগে সীতাকে কাছে টেনে নিলেন।

ঠিক সেই সময় স্বর্গের দেবতারা এবং মহারাজ দশরথ স্বর্গ থেকে রাম সীতাকে দেখতে এলেন। রাম সীতা তাঁদের প্রণাম করলেন। তাঁরা তাঁদের আশীর্বাদ করে স্বর্গে চলে গেলেন।

তারপর শুভদিন দেখে বশিষ্ঠদেব রামের অভিষেক করলেন। মাথায় পরিয়ে দেওয়া হোল রাজমুকুট। ইন্দ্রদেব স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে দিলেন সোনার পদ্মের মালা। সেটি পরিয়ে দেওয়া হোল রামচন্দ্রের গলায়, সারা অযোধ্যা আলোকমালায় ঝলমল করে উঠলো।

উত্তরকাণ্ড



রাম রাজা হয়েছেন। রামের মত রাজা আর সীতার মত রাণী আর হয় না। তাঁর সু-শাসনে দেশে শান্তির বন্যা বয়ে গেল। কিন্তু সীতা যে চিরদুঃখিনী। এত সুখ তাঁর সইবে কেন!

একদিন হঠাৎ গুপ্তচর এসে সংবাদ দিলো, মহারাজ, দেশের কিছু কিছু প্রজা, আপনি সীতাকে ঘরে নিয়েছেন বলে নিন্দে রটাচ্ছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে, সীতা বহুদিন রাক্ষসের ঘরে ছিল। এমন বউকে ঘরে নেওয়া উচিত হয়নি।

প্রজারা সীতার চরিত্রে সন্দেহ করছে বলে রাম অন্তরে খুব আঘাত পেলেন। অনেক ভাবলেন তিনি। প্রজাদের সুখী করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। সেইজন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি সীতাকে বাল্মিকীর আশ্রমে রেখে এসো।

তারপর একদিন রামের আদেশমত লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মিকীর আশ্রমে রেখে এলেন। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে লক্ষ্মণের। চোখ ফেটে জল পড়ছে বনের পাখীর, গাছপালার। মহর্ষি বাল্মিকী সীতাকে মেয়ের মত আদর করে আশ্রমে জায়গা দিলেন।

কিছুদিন পরে আশ্রমে সীতার যমজ ছেলে হলো। দেবশিশুর মত দেখতে ছেলে দু'টি। বাল্মিকী তাদের নাম দিলেন লব আর কুশ। তারা একটু বড় হলে বাল্মিকী তাদের লেখাপড়া আর অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। আর শিখিয়ে দিলেন 'রাম-চরিত' গান করা। দুই ভাই যখন এক সংগে 'রাম-চরিত' গান করতো বীণা বাজিয়ে তখন সমস্ত তপোবন আনন্দে মুখর হয়ে উঠতো।

সীতাকে বনবাসে দেওয়ার পর এদিকে বারোটা বছর কেটে গেছে। রাম বশিষ্টদেব আর মন্ত্রীদের সংগে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। চতুর্দিক থেকে এসে হাজির হলেন, রাজা, ব্রাহ্মণপণ্ডিত আর ঋষির দল। চারিদিকে উৎসবের আয়োজন। অষ্টপ্রহর শুধু বাজতে লাগলো শিঙা, ভেরী, কাঁসর, ঘণ্টা।

যজ্ঞ শুরু হোল, বাল্মিকীর সংগে সেই যজ্ঞে এসে হাজির হোল বীণা হাতে মাথায় জটা বাঁধা লব আর কুশ। তাদের কণ্ঠে রামায়ণ গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। রাম তাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো জলের ধারা। কৌশল্যা ছুটে এসে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। লব কুশ উত্তর দিলো, আমরা আশ্রমে থাকি। মহর্ষি বাল্মিকীর শিষ্য আমরা। আমাদের মায়ের নাম সীতা।

সীতার নাম শুনে কৌশল্যা জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। রামের

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। মহর্ষি বাল্মিকী বললেন, রাম আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি সীতাকে আবার ঘরে নিয়ে এসো, তার কোন দোষ নেই, তাকে আর কষ্ট দিয়ো না।

রামচন্দ্র তখন বললেন, আমি সবই জানি। তবুও সব জেনে আমি যা করেছি তা প্রজাদের জন্যেই করেছি। সীতাকে বনবাসে দেওয়ার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। রামের মুখের এই কথা শুনে বাল্মিকী সীতাকে আনতে পাঠালেন। তারপর সীতা এসে পৌছিলে তিনি সভার সকলকে বললেন, সীতার মত সতীলক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না। আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমার সমস্ত তপস্যার ফল যেন নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্যে আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা সীতাকে গ্রহণ করার অনুমতি দিন।

বাল্মিকীর এই কথা শুনে সকলেই একবাক্যে অনুমতি দিলো। কেবলমাত্র কয়েকটা দুষ্ট লোক মাথা নীচু করে বসে রইলো। তারা কোন কথা বললো না। রাম বুঝলেন, সীতা সম্পর্কে সকলের সন্দেহ এখনো দূর হয়নি। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগলো। সত্যিই ভগবান তাঁর কপালে সুখ লেখেননি।

সীতাও আর এ অপমান সহ্য করতে পারছিলেন না। ঠোঁট দু'টো থরথর করে কাঁপতে লাগলো তাঁর। তিনি গভীর দুঃখে বললেন, মা বসুমতী তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সীতার কথা শেষ না হতেই তাঁর পায়ের তলার মাটি ফেটে দু'খানা হয়ে গেল। আর তার ভেতর থেকে মা বসুমতী বেরিয়ে এসে সীতাকে কোলে নিয়ে আবার পাতালে চলে গেলেন। সকলে অবাক

হয়ে গেল। সভার সকলে হায় হায় করে উঠলো। লব কুশ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। যে লব কুশ মা ছাড়া আর কাউকে জানতো না, সেই মা তাদের চিরকালের মত চলে গেলেন।

এরপর থেকে রামের দিনগুলো খুব দুঃখের মধ্যে কাটতে লাগলো। কোন রকমে বেঁচে আছেন। শুধু কর্তব্য করে যাচ্ছেন। শান্তি নেই। সুখ নেই। এমন সময় হঠাৎ একদিন কালপুরুষ এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, মহারাজ আপনার সংগে আমার কয়েকটি গোপন কথা আছে। তবে একটা সর্ত। আমাদের কথা বলার সময়তে যদি সেখানে কেউ গিয়ে হাজির হয় তাহলে তাকে চিরকালের জন্যে ত্যাগ করতে হবে। রাম রাজী হলেন।

তাঁরা দু'জনে একটা ঘরে কথা বলতে ঢুকলেন। দরজায় পাহারা দিতে লাগলেন লক্ষ্মণ। এমন সময় কোথা থেকে দুর্বাশা মুনি এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, রামচন্দ্রের সংগে এখনি আমার দেখা করা দরকার। লক্ষ্মণ অনেক মিনতি করে বললেন, একটা গোপন কথায় ব্যস্ত আছেন, আপনি একটু দয়া করে অপেক্ষা করুন। একটু পরেই দেখা হবে। একথা শুনে দুর্বাশা রেগে আগুন। তিনি বললেন, এখনি যদি আমাকে দেখা করতে না দাও তাহলে আমি অভিশাপ দিয়ে সমস্ত অযোধ্যা ছারখার করে দেবো।

দুর্বাশার রাগ দেখে লক্ষ্মণ ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, নিজেকে বাঁচাতে গেলে সমস্ত অযোধ্যা ছারখার হয়ে যাবে। তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি রামের কাছে দুর্বাশার আগমন সংবাদ দিতে গেলেন। লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকতেই কালপুরুষ রামের সংগে আর কথা না বলে চলে গেলেন।

দুর্বাশা রামের সংগে কথা বলে চলে গেলেন। রাম নিশ্চল। তাঁর মনের ভেতর ঝড় উঠেছে। যে ভাই তাঁর সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে একমাত্র অবলম্বন তাকে আজ ত্যাগ করতে হবে। সীতাকে হারিয়ে কোন রকমে তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি বেঁচে থেকেও মৃত। কি নিদারুণ ভাগ্য তাঁর। আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

লক্ষ্মণ রামের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেলেন সরযূ নদীর তীরে, সেখানে জল ছুঁয়ে তিনি ধ্যানে বসলেন। তারপর যোগবলে দেহত্যাগ করলেন।

এরপর রামচন্দ্র আর বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না। চোখের সামনে আস্তে আস্তে সোনার সংসার ধ্বংস হয়ে যেতে লাগলো, প্রিয়জনেরা সব চলে গেল। কি লাভ আর বেঁচে থেকে।

তাই একদিন রাম নিজেও যোগবলে দেহত্যাগ করবার জন্যে সরযূ নদীর তীরে হাজির হলেন। মৃত্যুরূপী মহাকাল তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। অযোধ্যার বহুলোক তাঁর সংগে সংগে চললো। সকলেই একসংগে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন।

স্বর্গের দেবতা রাম এসেছিলেন পৃথিবীতে মানুষের দেহ ধরে। তারপর কাজ শেষ হলে ব্রহ্মার রথে চেপে আবার স্বর্গে ফিরে গেলেন। রামহীন পৃথিবী কাঙালের মত হয়ে গেল।

কত যুগ কেটে গেছে। আজও মানুষ রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখে। রামের মত রাজা চায়। লক্ষ্মণের মত ভাই চায়। সীতার মত নারী হতে চায়। এঁরা আমাদের চিরকালের আদর্শ। তাই সুখে-দুঃখে তাঁদের আমরা স্মরণ করি। আমাদের অন্তরের ভক্তি প্রণাম নিবেদন করি।